কবে পোহাইবে রাতি

— উপন্যাস —

রচনা : আই. পপোভ্
অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
কলেজ স্কোয়ার :: কলিকাতা

এই উপন্যাসখানার ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হয় মস্কোর 'বিদেশী ভাষা প্রকাশনী' হইতে, 'হোয়াইল্ ওয়েটিং ফর ডন্' নামে

প্রথম বাংলা সংস্করণ

—দাম আড়াই টাকা—

প্রকাশক : বিমল মিত্র, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, মুদ্রাপক : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ৩২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

অনুবাদকের ভূমিকা

১৯৪০ সালের ২৮শে মে রাজা লিওপোল্ডের আদেশে বেলজিয়ানবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু তারপরেও একদল দুঃসাহসী বেলজিয়ান অস্ত্র-ত্যাগ করতে অস্বীকৃত হয়। প্রতি কারখানায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি জার্ম্মান-শিবিরের আশেপাশে তারা ছড়িয়ে পড়ে এবং ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপের ভিতর দিয়ে জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আরও এক দল ডাচ্ সীমান্ত পার হয়ে সমুদ্র-পথে ইংলণ্ডে হাজির হয় এবং বেলজিয়ান বাহিনী গঠন ক'রে ইংরাজ সৈন্যের পাশাপাশি যুদ্ধ করে।

তারপর আসে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন—ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। হিট্লারের সৈন্য বাহিনী সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে। লাল ফৌজের অপূর্ব্ব প্রতিরোধ, আশ্চর্য্য রণ-কৌশল এবং নির্ভীক দেশপ্রেম সেই ইউরোপ-জয়ী দানব-শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। লাল ফৌজের সাফল্য একটা উজ্জ্বল প্রেরণা ও অচঞ্চল প্রতিজ্ঞার স্বাক্ষর নিয়ে নিষ্প্রদীপ ইউরোপের সমগ্র জনসাধারণের মনে একটা আশার আলো জাগিয়ে তোলে। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধিতার সঙ্কল্প নিয়ে দেশে দেশে জনসাধারণ একতাবদ্ধ হয়। দূর মস্কোর আকাশের উজ্জ্বল তারা তাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। মহাযুদ্ধের এই অংশের ইতিহাস আজও অংশতঃ অনাবিষ্কৃত ও অলিখিত।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের একটা শান্ত ও স্বপ্নময় প্রভাতে এই বইয়ের সুরু। মস্কোর কাছে যুদ্ধ চলছে—মস্কোর রক্তাক্ত মাটিতে সমগ্র পৃথিবীর অনাগত যুগের ইতিহাস রেখায়িত হ'চ্ছে। ফ্রান্স হতে জার্ম্মান বাহিনীর দ্রুত স্থানান্তর-কার্য্য সুরু হয়েছে। ফ্রান্স ও রাশিয়ার এই যোগাযোগ-পথকে ধ্বংস করবার সঙ্কল্প নিয়ে বেলজিয়ামে একটা গুপ্ত আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই বইয়ে তারই একটা আলেখ্য পাওয়া যাবে।

বিজিত জাতিকে আপন বশে আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে জার্মানরা নানা অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। একদিকে যেমন বল-প্রয়োগ করেছে, শারীরিক যন্ত্রণা দিয়েছে, তেমনি আবার নানা উপায়ে তাদের মানসিক অধঃপতন ঘটিয়েছে, নীতি-গত কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছে। এই বইয়ে পপোভ্ তারই একটা নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

অনুবাদ সম্পর্কে দু'একটা বক্তব্য আছে। বাংলা অনুবাদে সাধারণতঃ দেখা যায়—অনুবাদক মূল বইয়ের ইচ্ছামত কাটছাঁট করেন। মূল বইয়ের কোন পরিবর্তন করবার অধিকার অনুবাদকের আছে কিনা—সেকথা বিচার্য্য। অনুবাদ করবার সময় আমি মূল বইকে অক্ষত রেখেছি এবং তার ভাষা ও ষ্টাইল অবিকৃত রাখবার চেষ্টা করেছি। কতদূর সফল হয়েছি—পাঠকগণ বিচার করবেন।

কবে পোহাইবে রাতি

৮।৪৫—১১।ন. ২৩

—তোমার সঙ্গে কয়েকজন লোক দেখা করতে এসেছে, বেল-বেল।

কথাগুলি বলতে বলতে ভ্যান্ একেনের পড়বার ঘরে লুসা ঢুকলো। ছেলেবেলায় ভ্যান্ একেন্ নিজের নাম "এ্যাল্‌বার্ট" উচ্চারণ করতে পারতো না, বলতো বেল-বেল—তার পিসীমা লুসা এখনও তাকে সেই নামেই ডাকে।

ডিসেম্বর মাসের একটা শান্ত ও স্বপ্নময় সকাল।

ভ্যান একেন্ তখন একটা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে একটি প্রাচীন ওয়ালুন মিনিয়েচার পরীক্ষা করছিল। তার থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে খুসী-ভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করলো—কে ডাকছে পিসীমা?

লুসা ধরা-গলায় উচ্চারণ করলো—ভগবান আমাদের রক্ষা করুন।

এ্যাল্‌বার্ট লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং নিজের অজান্তেই তাড়াতাড়ি সেই মিনিয়েচারটিকে ড্রয়ারে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখলো।

—জার্ম্মানরা?

—হ্যাঁ বেল-বেল। তারা খাবার ঘরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

—কিন্তু তাহলেও আজ যে রবিবার, লুসা।

কিন্তু কথাটা বলে সে নিজেই এই ভেবে আশ্চর্য্য হোলো এরকম ছেলেমানুষের মত কথা তার মুখ দিয়ে বার হোলো কি করে? সে এক্ষুনি যাচ্ছে, এই খবরটা দিয়ে সে লুসাকে পাঠিয়ে দিল।

লুসা চলে গেল আর ভ্যান্ একেন তার পড়বার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—এই লোকগুলি যেখানেই যায়, দুর্ভাগ্য ডেকে নিয়ে আসে। কিন্তু কি করা যাবে? ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।

্যালবার্ট দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে দরজার হাতলে হাত রেখে দাঁড়ালো। ছাড়ি করে কি লাভ? এখনও সে নিজের ইচ্ছামত চলতে ফিরতে পারে। এই স্বাধীনতাটুকুও এই মুহূর্ত্তের পর আর তার থাকবে না।

াঠারো মাস আগে জুন মাসের এক সন্ধ্যায় জার্ম্মানরা সহরে প্রবেশ করলো। দিন হতে প্রতি মুহূর্ত্তে ভ্যান্ একেন্ অনুভব করেছে, তার জীবনে আর কোন নিশ্চয়তা নেই।

স পালায়নি কেন? ভ্যান্ একেন হাসলো। কোথায় পালাবে? লোকেরা ও আতঙ্কে পাগলের মত ছুটাছুটি করছে। রাস্তায়, ফুটপাথে, নদীর ধারে, । জঙ্গলে, সঙ্কীর্ণ গিরি-পথে—সর্ব্বত্র এই এক দৃশ্য। পালিয়ে কি লাভ? বার্ট জানে সাধারণ নাগরিকদের জীবনে এর পর বহু অত্যাচার আসবে, বহু তাদের জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে। তাদের সেই দুর্ভাগ্যের সাথে নিজের জীবন ভাগী হতে হবে—এটা সে তার কর্ত্তব্য বলে মনে করে।

ন্দেহ, অবিশ্বাস এবং হতাশায় এ্যালবার্ট যেমন দুলে উঠতো, তেমনি আবার বিশ্বাসে ও উজ্জ্বল আশায় সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতো। কোন কাজে এতটুকু ্য সে প্রকাশ করতো না। একটা সাধারণ বিবেচনা-বোধ তার ছিল। তবুও এই মুহূর্ত্তে তার শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। র দিকে হাত রেখে সে একহাত দিয়ে আর একটা হাত চেপে ধরলো যেন লগুলো বেঁকে মুষ্টিবদ্ধ না হয়ে যায়। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সা, নালার শান্ত জলে একটা গাছের ভাঙ্গা ডাল কেঁপে কেঁপে উঠছে— দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বহুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ফ্ল্যাণ্ডার্সের প্রায় সবাই এ্যালবার্টকে চিনতো। বাগান সম্পর্কে তার নিপুণতার স রীতিমত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। ঘেণ্ট, এমন কি হল্যাণ্ড থেকে পর্য্যন্ত লোক আসতো এ সম্পর্কে তার উপদেশ নেবার জন্য।

প্রকৃতি এবং তার সৃষ্টি-রহস্য নিয়ে এ্যালবার্ট ডুবে থাকতো। ক্রমবিকাশের অনুসরণ করে এক একটা নতুন প্রাণের আবির্ভাব হয় এবং ধীরে ধীরে শক্তি

সঞ্চয় করে—তারপর সহস্র বিরোধ, সহস্র পরিবর্ত্তন এবং সহস্র মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তার নবজন্ম ঘটে। এ্যালবার্ট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো আর এই সবের ভিতর প্রকৃতির এক দুর্লঙ্ঘ নিয়মকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতো।

এ্যালবার্ট জানতো, বিরাট সম্ভাবনা তার জন্য অপেক্ষা করছে। পৃথিবীর গভীর প্রদেশে সহস্র গ্রন্থির বন্ধন রেখে সে মাথা তুলেছে এবং সূর্য্যের প্রতি তার দুর্গম যাত্রা জয়যুক্ত হবে।

এ্যালবার্ট তার পূর্ব্ব-পুরুষদের কথা ভাবতো। সীজারের আক্রমণ থেকে সুরু করে বহু শতাব্দীর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তারা নির্ভীক ভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, কোন বাধার সামনে নিজেদের পতাকা অবনমিত করেনি। এমন কি উত্তর-সাগরের দুর্ব্বার বন্যার হাত থেকে নীচু জমিগুলিকে বাঁচাবার জন্য তারা অপ্রতিরোধ্য বাঁধা খাড়া করেছিল। সে বিশ্বাস করতো, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁদের এই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি।

এ্যালবার্ট জানতো, নিষ্ঠুর শীতের পর আসবে বসন্ত, সমস্ত গ্লানি মুছে যাবে— স্বাধীনতা ফিরে আসবে। কিন্তু বাইরে যখন ঝোড়ো হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠেছে তখন রাজপথ পরিত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুন্দর আবহাওয়া ফিরে আসুক, ততদিন আত্মগোপন করো।

তার মাতৃভূমির ইতিহাসে যে দুর্ভাগ্য কালো হয়ে উঠেছে, তার আঘাত এ্যালবার্টের মনে তার পূর্ব্ব-পুরুষদের বিচিত্র গৌরবময় কাহিনী ও অতীত ইতিহাসের প্রতি গভীর মমতা জাগিয়ে তুলেছে।

তার নিজের সহর তার কাছে মনে হোতো একটা প্রাণবন্ত যাদুঘর। সহরের কেন্দ্রস্থলে হচ্ছে গ্র্যাণ্ড প্লেস স্কোয়ার। তার ভিতর দিয়ে প্রাচীন নদীটি বয়ে গেছে। নদীটাকে এখন অবশ্য একটা নালা বলা চলে, কিন্তু সেটা পার হবার জন্য রয়েছে রোমানদের তৈরী পাথরের একটা সেতু। স্কোয়ারের মাঝখানে টাউনহল। তার পাশে একটা একতলা বাড়ী—মধ্যযুগীয় প্রস্তর-স্থপতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাড়ীটায় এখন রাজমিস্ত্রী ট্রেড্-ইউনিয়নের স্থানীয় অফিস স্থান পেয়েছে। আরও কিছুটা দূরে চিত্রকরদের সরাইখানা—নাম "আণ্ডার দি সোয়ালোস্ উইংগ্।"

পাঁচ শতাব্দী ধরে এই সরাইখানাটা দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের উপর সেন্ট জাষ্টিনের গীর্জ্জা ফ্লেমিশ সমাজের গৌরবময় যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে এদের কোন ক্ষতি হয়নি। মে-দিবসে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা বার হোতো। রাজমিস্ত্রীদের ইউনিয়নের পুরোভাগে সগর্ব্বে পতাকা তুলে ধরা হোতো। "অ্যানো ডোমিনি ১৩০২"—পতাকার গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা এই কথাগুলি ঝল্‌সে উঠতো। শোনা যায়, ১৩০২ সালে এই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে প্রস্তর স্থপতিরা কোরট্রাই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল এবং ফ্ল্যাণ্ডার্স সহরের পৌর-সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিল।

জার্ম্মান আগমনের সাথে সাথে প্রথম সন্ধ্যাতেই এ্যালবার্টের নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ও অক্ষম বলে মনে হোলো। জার্ম্মান আক্রমণকারীরা রোমান ব্রিজের কাছে সেণ্ট জাষ্টিনের মূর্ত্তিকে ভেঙ্গে ফেললো। টাউনহলের ভিতর হতে আর্ত্তনাদ ও গুলির শব্দ দূর থেকে শোনা গেল—মনে হোলো সেখানে জার্ম্মানরা বন্দীদের বিচার করছে।

যা কিছু প্রিয়—শৈশবের গল্প, ছুটির দিনের আনন্দ, প্রিয় বন্ধুর সাহচর্য্য, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, বিচিত্র অনুভূতি, দুঃখ আনন্দ, বিরহ মিলন, সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত—সব কিছু হারিয়ে গেল এবং নিঃশেষে মুছে গেল।

এবং সেই প্রথম সন্ধ্যাতেই এ্যালবার্ট লুসাকে রাজী করিয়ে তার সাহায্যে "আণ্ডার দি সোয়ালোস্ উইংগ্" সরাইখানা থেকে দুটো ওক্ কাঠের আসন গোপনে সরিয়ে ফেলল। পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বে এই সরাইখানার প্রতিষ্ঠাতা এই আসনগুলির উপরেই বসতেন। সরাইখানার ভিতরে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আসনদুটিকে রেখে একটা মোটা শিকল দিয়ে স্থানটিকে ঘিরে রাখা হোতো। আক্রমণের পর প্রথম কয়েক ঘণ্টার গোলমালের মধ্যে লুসা ও এ্যালবার্ট প্রস্তর স্থপতিদের সেই পতাকাটাকেও উদ্ধার করলো।

তারপর দুজন সেই আসন দুটো এবং পতাকাটি নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে এলো। একতলার একটি বড় অব্যবহৃত ঘরে তারা সেই জিনিষগুলি সাজিয়ে রাখলো। ঘরটায় আলো খুব কম এবং কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব। জানালা খুললেই দেখা যায়, কয়েক হাত দূরে খাড়া প্রাচীরের মত একটা পাহাড় উঠে গেছে।

এই পাহাড়টা হচ্ছে একটা নদীর দক্ষিণ পাড়। বৃদ্ধ লোকেরা বলে ভ্যান্ একেনের প্র-পিতামহ এই বাড়ীটা একটা দুর্গের ধ্বংসাবশের উপর তৈরী করেন। এখনও এই বাড়ীর এক তলার খালি ঘরের ভিতর দিয়ে একটা গুপ্ত পথে মাটির তলার একটা বড় হলের ভিতর যাওয়া যায়। ফ্ল্যাণ্ডার্সের স্বাধীনতা শক্রর হাতে যখনই বিপন্ন হয়েছে, ফ্লেমিশ দেশপ্রেমিকরা এইস্থানে মিলিত হয়েছেন এবং কার্য্য-পন্থা ঠিক করেছেন। বৃদ্ধরা আরও বলতো, ভ্যান্ একেনের বাড়ীর সম্পূর্ণ সীমানা জুড়ে মাটির তলার এই ঘরখানি বিস্তৃত এবং নদীর বাম পাড়ে এই ঘর হতে একটা সঙ্কীর্ণ বহিঃগমনের পথ আছে।

সহরের ভিতরে এবং আশেপাশে বহু গহ্বর এবং ভূগর্ভের ভিতর বহু পথ ও গুহা ছিল। কিন্তু ভ্যান্ একেনদের বাড়ীতে মাটির তলায় কোন ঘর এবং সেখান থেকে নদীর পাড়ে গুপ্ত কোন পথের কথা ভ্যান্ একেন্‌রা পুরুষানুক্রমে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এসেছে। এর পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকতে পারে, কিংবা হয়ত এটা একটা কুসংস্কার বা সতর্কতা। পিতা তার পুত্রকে পুরুষানুক্রমে এই মন্ত্রগুপ্তি দান করে যেত। ভ্যান্ একেন বংশের কেউ কোনদিন এটা স্বীকার করেনি। এমনকি বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এই গোপনতাকে ভঙ্গ করতো না। ভ্যান্ একেন বংশের ফ্লেমিশ সতর্কতা এবং ওয়ালুন অনমনীয়তা ব্যর্থ হয়নি। ফ্লেমিংগ পুরুষরা ওয়ালুন মেয়েদের বিয়ে করতো—ভ্যান্ একেন বংশে এটা ছিল চিরাচরিত নিয়ম। এ্যালবার্টের দাদা ম্যাথুকে বিয়ে করতে হয়েছিল ব্লিন্‌চ্ সহরে। কারণ তার নিজের দেশে ও তার আশেপাশে কোন বিবাহযোগ্যা ওয়ালুন মেয়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ব্লিন্‌চ্ সহরের মধ্যযুগীয় প্রথানুযায়ী তাকে পাণিপ্রার্থী হয়ে "অল্ সেন্টস্" দিবসে সেখানে যেতে হয়েছিল। এ্যালবার্ট নিজে চল্লিশ বৎসর বয়সেও অবিবাহিত ছিল।

সেই আসন এবং পতাকা সরিয়ে ফেলবার পর তারা একজন ওয়ালুন কারিগরের তৈরী একটি কাঠের মূর্ত্তি সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের ভিতর নিয়ে এলো। মূর্ত্তিটি ভালুকের—আর্দ্দেনেশ্ জঙ্গলের ভালুক এবং তার কয়েকটি বাচ্চা। গুপ্ত-কক্ষের প্রবেশ পথকে গোপন করবার জন্য তারা মূর্ত্তিটাকে সেই পথের সামনে

রাখলো। এইভাবে একটি একটি করে সহরের সব কিছু স্মৃতি ভ্যান্ একেনের ঘরে জমা হোলো।

প্রতিদিন নানাদিক থেকে বহু লোক এ্যালবার্টের কাছে আসতো। সহরের অতীত স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে, এমন সবকিছুকে তারা সঙ্গে নিয়ে আসতো। এ্যালবার্টের কাছে সেগুলি অম্লান ও অক্ষত থাকবে।

প্রতি মুহূর্ত্তে নির্য্যাতিত হয়ে সহরবাসীদের যে করে হোক ধারণা হয়েছিল যে, এই সমস্ত পবিত্র সম্পত্তির পক্ষে ভ্যান্ একেনের বাড়ী হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়। বহুকাল ধরে ভ্যান্ একেন বংশকে লোকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে এসেছে—এটাই বোধ হয় এই ধারণা হবার কারণ।

নেদারল্যাণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য দক্ষিণ প্রদেশগুলির আন্দোলনে ভ্যান্ একেনের পিতামহ যোগ দিয়েছিলেন। এইজন্য তাঁর ফ্লেমিশ জন্ম সত্ত্বেও ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পর গঠিত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের নেতারা তাঁকে আপন বলে ভাবতো ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা সংগ্রামে কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করবার স্মৃতি ধারণ করে একটি স্মারকলিপি ভ্যান্ একনের বাড়ীতে ছিল।

ম্যাথ্ ও এ্যালবার্টের পিতা ছিলেন ঘেণ্ট শ্রমিকদের সমবায় আন্দোলনের একজন উদ্যোক্তা। ফ্ল্যাণ্ডার্সের জনপ্রিয় শ্রমিক-নেতা আঁসেলের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। নিজের দেশে তিনি "Maison du Peuple" নামে সমবায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এ্যালবার্টের দাদা ম্যাথু ভ্যান্ একেনের বয়স আটচল্লিশ বছর। গত মহাযুদ্ধের সময় সে বিশ বছরের একজন যুবক—সে সময় সারা বেলজিয়াম জুড়ে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। যে সমস্ত গুপ্ত দলের নেতারা আত্মগোপন করে থাকতো এবং বেলজিয়ান ভলাণ্টিয়ারদের ইংল্যাণ্ডে বেলজিয়ান সৈন্যদলে পাঠিয়ে দিত, ম্যাথু ছিল তাদের একজন। সে ডাচ সীমান্তের এক গুপ্ত পথ ব্যবহার করে জার্ম্মানদের চোখে ধূলা দিত। জার্ম্মানরা বেলজিয়ামের যে অংশ অধিকার করতে পারেনি, সেই জমিতে দাঁড়িয়ে বেলজিয়ানরা ইংরাজ সৈন্যের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছিল।

বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় ম্যাথুকে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানায় সব চেয়ে দক্ষ শ্রমিক

বলে মনে করা হোতো, কিন্তু জার্মানরা এগিয়ে আসবার সাথে সাথে হঠাৎ একদিন সে দেশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত সঙ্গে নেবার সময় পেল না। লোকে বললো, ভার্ভিয়ার্স, হারবেষ্টাল ও লিজ্ কারখানায় সে জার্মানদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে এবং ছদ্মনামে বাস করছে।

ভ্যান্ একেনদের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ হচ্ছে ম্যাথুর ছেলে রেণী—বাইশ বছর বয়স, বিমান বাহিনীতে একজন লেফ্টেনান্ট্। আক্রমণের প্রথম দিকে সে জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। বেলজিয়ান বাহিনী আত্মসমর্পণ করবার পরেও যারা অস্ত্র ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছিল, সে ছিল তাদের একজন। তার সম্পর্কে সহরের লোকেরা নানা কথা বলাবলি করতো। কেউ কেউ বলে, সে ইংলণ্ডে পালিয়ে গেছে এবং এখনও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে। অন্য একদল বলে, ডানকার্কে সে বন্দী হয়েছে। আর একদল বলে সে বেলজিয়াম ছেড়ে পালাতে পারেনি এবং তার পিতার মত আত্মগোপন করে জার্মানদের বিরুদ্ধে গুপ্ত-যুদ্ধ পরিচালনা করছে। একাধিক বিশ্বাসযোগ্য লোক এই শেষোক্ত দলকেই সমর্থন করেছেন। রেণীর মা ম্যারি ভ্যান্ একেন প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করে হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে তার ছেলে ও স্বামী ফিরে আসবে এবং তাদের সকলকে শত্রু-অধিকৃত এলাকার বাইরে গুপ্ত পথে বার করে নিয়ে যাবে।

এইজন্য সহরে যখন বিপদ ঘনিয়ে এলো, তখন ভ্যান একেনদের উপর লোকের আস্থা তাদের সেই কালো বিষণ্ণতায় আলোর একটি রেখার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার প্রতি জনসাধারণের এই আস্থা এ্যালবার্টের কাছে একটা বোঝার মত মনে হোলো। যে মুহূর্ত্তে সে অনুভব করলো শত্রুর হাত থেকে সহরের প্রাচীন সম্পত্তি রক্ষা করবার গুরু দায়িত্ব তার উপর সেই মুহূর্ত্ত হতে প্রতিটি পদক্ষেপে সে একটা বন্ধন অনুভব করলো। কোন স্বাধীনতাই আর তার রইলো না। জার্মানদের সাথে সর্ব্বপ্রকার সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা, এরপর থেকে এ্যালবার্ট তার কর্ত্তব্য বলে মনে করলো।

নিজের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করবার জন্য একটা অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে এ্যালবার্ট ত সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করলো। জার্মানদের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ সে এড়িয়ে চ

লাগল এবং প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তন করলো না। হট্-হাউস, ফ্লাওয়ার-বেড, বাগান—কোথাও কোন কাজে সে বিরতি দিল না।

কিন্তু বিদেশী শাসকের সাথে এ্যালবার্টের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে উঠলো।

একদিন সন্ধ্যার সময় সে একটা আপেল গাছের কাছে কাজ করছিল, এমন সময় লুসা একটি লোককে সঙ্গে করে তার কাছে নিয়ে এলো। লোকটি গোল টাওয়ারের পাহারাদার—গোল টাওয়ার নাম দেওয়া হয়েছে স্প্যানিশ্ শাসনের সময়কার একটি দুর্গের একাংশকে। বৃদ্ধ লোকটি একটি ভারি থলে এ্যালবার্টের কাছে রেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। এ্যালবার্ট তাকিয়ে দেখল, লোকটির হাতদুটো কাঁপছে।

সে বললো—আমি কোনরকমে এটা নিয়ে এসেছি। আমার পা'দুটো আর চলতে চায় না, শরীরের ভারে ভেঙ্গে পড়ে। আমার ভয় হয়েছিল সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনার হাতে আমি ধরা পড়ব।

ব্যাগের ভিতর সহরের পুরাণো রেকর্ডের একটা প্যাকেট ছিল। লোকটি বললো, জার্ম্মানরা এই সব কাগজ পুড়িয়ে আগুন জ্বালছে।

—পঞ্চাশ বছর আমি এই দপ্তর পাহারা দিয়েছি। এই সব কাগজ পড়বার জন্য কত দেশ থেকে কত জ্ঞানী লোক আসত। এমন কি অনেক আমেরিকান পর্য্যন্ত এসেছে। আর সেই কাগজ জার্ম্মানরা পুড়িয়ে ফেলছে। সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনাকে আমি বলেছিলাম, 'আমাদের এইসব পুরাণো রেকর্ড না পুড়িয়ে তোমরা বরং আমাকে পুড়িয়ে আগুন তৈরী করো।' সে বললো, 'তুমি এখনও একটু ভিজে রয়েছ, বুড়ো। তোমাকে আগুনে দিলে বড্ড ধোঁয়া হবে। আর একটু শুকিয়ে গেলে পর তোমাকেও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করবো।' সব খুনে ডাকাত! তোমাকে একটা অনুরোধ করছি। তুমি ভ্যান্ একেন বংশের ছেলে। যতটুকু পার বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করো। আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ লোকটির চোখদুটো জলে ভরে গেল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় এ্যালবার্ট তার নির্জ্জন পড়বার ঘরে বসে সেই প্যাকেটটা

খুলে বসলো। কাগজগুলো সব হল্‌দে হয়ে গেছে। অতীতের বহু বিস্মৃত ঘটনার বিবরণ পাতায় পাতায় লেখা।

মেয়রের চিঠির ভিতরে সে আঠারো বছর বয়সের একটি মেয়ের আত্মত্যাগের কাহিনী পড়লো। '৭০ সালে সহরে একবার একটা বড় আগুন লাগে। সেই অগ্নি-ব্যূহের ভিতর হতে তিনটি ছোট ছোট শিশুকে মেয়েটি উদ্ধার করেছিল। একটি জ্বলন্ত বাড়ীর ভিতর হতে যখন সে তৃতীয় শিশুটিকে কোলে করে বাইরে নিয়ে আসছিল, তখন তার চুলে ও পোষাকে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তে আগুনের শিখা তাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে। সেই অবস্থাতেই সে মাঠ পার হয়ে নদীর দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু জলের ধারে পৌঁছুবার আগেই সে হার্ট-ফেল করে। এ্যালবার্ট এতদিন পর জানতে পারলো তার বাড়ীর পাশের রাস্তাটার নাম কেন "Street of the Flaming Girl"। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে এই খবরটা জানতো না বলে রীতিমত লজ্জিত বোধ করলো। মনে মনে এতদিন সে ধারণা করেছিল এই রাস্তাটার নামের সাথে কোন "উজ্জ্বল" প্রেমের কাহিনী জড়িত। আজ সে জানতে পারলো, "উজ্জ্বল" প্রেমের কাহিনী কথাটা ঠিক কিন্তু সে "উজ্জ্বল" প্রেম ছিল সমগ্র মানবজাতির প্রতি।

এ্যালবার্ট ঠিক করলো রাউণ্ড টাওয়ারে এখনও যে সকল পুরানো রেকর্ড আছে, সেগুলি সে উদ্ধার করবে। সে কয়েকবার লুকিয়ে সেখানে গেল এবং যতগুলি সম্ভব পুরানো কাগজের বাণ্ডিল বয়ে নিয়ে এলো।

কিছুদিন পর একদিন ওয়াচম্যান্ এসে এ্যালবার্টকে জানালো সার্জেন্ট মেজর মাগুনার আদেশ—কেউ টাওয়ারের ভিতর ঢুকতে পারবে না, ঢুকলে পর গুলি করে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু তবুও এ্যালবার্ট টাওয়ারে যাতায়াত একদিনের জন্যও বন্ধ করলো না। প্রতি সন্ধ্যায় সে সেখানে যেত এবং বিশেষ করে একটি ফাইল খুঁজতো। সেই ফাইলের পাতায় একটি ডাক্তারের কাহিনী বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। '৬০ সালে সহরে একবার ভীষণ মহামারী হয়, সে সময় একজন ডাক্তার বিনা পয়সায় গরীবদের চিকিৎসা করেছিলেন। ডাক্তারের অক্লান্ত চেষ্টায় মহামারীর কবল থেকে সহর মুক্ত হোলো কিন্তু ডাক্তার নিজে বাঁচতে পারলেন না। সহরের

অন্য সমস্ত লোক যখন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে উৎসব মুখর, তখন ডাক্তারের শেষ নিঃশ্বাস মহামারীর সমাপ্তি-রেখা টানলো।

মাগুনার নিষ্ঠুর নির্দ্দয়তার কথা এ্যালবার্ট জানতো কিন্তু তবুও কয়েকটা পুরানো কাগজের বাণ্ডিল উদ্ধার করবার জন্য সে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের জীবন বিপন্ন করতো। নিজের ভিতর সে একটা তীব্র উত্তেজনা ও আবেগ অনুভব করতো—নগরের ঐতিহাসিক উপাদান অম্লান ও অক্ষত রাখতে হবে। এই সমস্ত পুরানো কাগজ পড়ে সে দেখলো, লোভ হিংসা ও নিষ্ঠুরতার নানা কাহিনীর পাশাপাশি নির্ভীক ও নিঃস্বার্থ কার্য্যাবলীর বহু বিবরণ লেখা আছে। এ্যালবার্টের মনে হোলো, এই সব পুরানো কাগজের পাতায় পাতায় এক অপঠিত ও অকথিত রূপকথা তার কাছে সর্ব্বপ্রথম ধরা দিচ্ছে। সেই বিচিত্র গল্পে মানুষের অমর প্রেম ও তার অন্তরের মহত্ত্ব প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো যেন।

কিন্তু যখন এ্যালবার্ট ভাবতো, তার দেশের এই অমূল্য সম্পদ বিদেশী হাতের উপেক্ষিত স্পর্শে কলুষিত হচ্ছে, তখন সে কেঁপে উঠতো। আপন কর্ম্মের ভিতর দিয়ে জীবনকে যাঁরা সুন্দরতম ও মহত্তম করে তুলেছেন, তাঁদের পদরেখা যে সব পথকে চিহ্নিত করে রেখেছে, সেই পথে জার্ম্মান সৈন্যরা যখন বুটের শব্দ তুলে সগর্ব্বে যাতায়াত করতো তখন এক এক সময় এ্যালবার্টের হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে উঠতো।

এ্যালবার্ট একে একে সমস্ত পুরানো রেকর্ড ও নথিপত্র তার নিজের ঘরে জমা করলো। গ্রীষ্মের মধ্যেই সাঁইত্রিশটি বিভিন্ন দ্রব্য অতীতের নানা স্মৃতি বহন করে তার যাদুঘরে এসে দাঁড়ালো।

তারপর শরত ও শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় এ্যালবার্ট ঠিক করলো, দেশের গত কয়েক বৎসরের ইতিহাস সে লিখে রাখবে। নগরের মহৎ ও উদার ঘটনাবলীর একটা আনুক্রমিক আলেখ্য সে সৃষ্টি করবে। বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন লোকের বৃত্তান্ত সে সংগ্রহ করবে।

সহরের বিভিন্ন বংশের ইতিহাস লিখবার সময় তার পিসীমা লুসা তাকে সাহায্য করলো। এই সহরেই তার জন্ম এবং এই সহরেই জীবনের আটষট্টি বছর সে

প্রতি বুধবার নদীর ধারে পাহাড়ের ওপাশে সমাধিস্থানে যেত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার এ্যালবার্টের সাথে হিসাব পরীক্ষা করতো।

বনস্পতি যেমন মূলদেশের মাটিকে জড়িয়ে ধরে বড় হয় এবং ঝড় বাতাসে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে কিন্তু সে বন্ধন এতটুকু শিথিল করে না, তেমনি লুসা তার প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্কীর্ণতাকে গভীর বন্ধনে জড়িয়ে ধরেছে, এমন কি মনে মনেও একবারও সে নিজের দেওয়া সেই গণ্ডী লঙ্ঘন করে না। তার জীবন ছোট ফুলের টবে রোপন করা একটা বাড়ন্ত গাছের মত। প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় তার সেই গণ্ডী বাঁধা জীবনে বিদ্রোহী শাখাপ্রশাখাগুলিকে ছেঁটে বাদ দিতে হয়। কিন্তু তার জীবনের গভীর অন্তর্দেশে প্রাণধারা কখনও শুষ্ক হোতো না। দেশের আচার ব্যবহার দেশের সহর গ্রামকে সে ভালবাসত। তার স্কুল-জীবনের সময় থেকে তার ঘরের দেওয়ালে একটা ম্যাপ টাঙ্গানো ছিল, তার তলায় লেখা "Map of the Greatness of Little Belgium"। লেখাটা সে পড়ত আর দুলে দুলে উঠতো।

এখন লুসা বুঝতে পারলো এ্যালবার্ট কেন সহরের প্রাচীন স্মৃতিগুলি সংগ্রহ করে রাখছে তখন তার মনে হোলো এই কাজে সাহায্য করা তার ভাগ্য-লিপি। সর্ব্ব-প্রথম যে জিনিষ সে সেই "মিউজিয়ামে" নিয়ে এলো, সেটা হচ্ছে সেই "Map of the Greatness of Little Belgium"। ম্যাপটাকে সে একটা প্রাচীন স্মৃতি বলে মনে করতো।

সহরের প্রাচীন নিদর্শনগুলি সংগ্রহ করবার কাজে লুসা মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করলো। কিন্তু তবুও এতদিনকার মেনে চলা বিধিনিষেধের গণ্ডী পার হয়ে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। আটষট্টি বছর বয়স পর্য্যন্ত লুসার সবকটি চুল কালো ছিল কিন্তু এর পর এক সপ্তাহে তার সব চুল সাদা হয়ে গেল। 'মিউজিয়ামে' ঢুকে তার মনে হোতো তার এতদিনকার চেনা প্রিয় দেশ একটা বিক্ষিপ্ত বিস্তৃতি ত্যাগ করে সেই ঘরের ভিতর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এ্যালবার্ট নিজেও সব সময় শঙ্কিত থাকতো। মাতৃভূমির অতীতের যে গৌরবময় সম্পদ সে রক্ষা করছে, তার উপর বিদেশী শাসকের পঙ্কিল হাত না পড়ে, সে দায়িত্ব তার।

জার্মান আক্রমণের প্রথম কয়েকদিন অন্য সবার মত সেও ভাবতো গত মহাযুদ্ধের মত এবারও জার্মানরা শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক সহর ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের আশা ম্লান হয়ে গেল। জার্মানদের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের প্রতিরোধের কথা যখন তারা শুনলো তখন আবার তারা আশায় বুক বাঁধলো।

তারপর যেদিন জার্মানরা ঘোষণা করলো মস্কোর কাছে যুদ্ধ স্বুরু হয়েছে, সেদিন এ্যালবার্টের মনে হোলো স্বদূর রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ানদের জয়পরাজয়ের উপর তার ব্যক্তিগত ভাগ্য নির্ভর করছে। পুরানো স্মৃতিগুলি রক্ষা করবার উপায় সম্পর্কে নির্জ্জনে চিন্তা করে এ্যালবার্ট দুটো সিদ্ধান্ত করলো। সব কিছু রাশিয়ার জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করছে। জার্মানরা যদি মস্কো অধিকার করতে পারে তবে এ যুদ্ধে তাদের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। তা যদি না হয় তবে রাশিয়ানরা প্রতিরোধের প্রাচীর তুলে বিজয় গৌরবে এগিয়ে আসবে। কিন্তু এ্যালবার্টের মনে সব সময় একটা ভয় থাকতো, আতঙ্কিত মুহূর্ত্তগুলি গুণে গুণে দিন কাটাতো। যদি কোনদিন ···কিন্তু সে রকম দিন না আসাই ভাল। কিন্তু অবশেষে সেই দিন এল—জার্মানরা তার বাড়ীতে প্রবেশ করলো। মস্কোর ঐতিহাসিক যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারিত হবার আগেই তারা এলো। তার উপর এক পুণ্য দায়িত্ব রয়েছে—সে এখন কি করবে ?

*　　　*　　　*

মনে মনে এ্যালবার্ট নিজেকে তৈরী করে নিল। শান্ত ও সংযতভাবে সে জার্মানদের সঙ্গে দেখা করলো। সে ঠিক করেছিল, প্রাণপণে সে চেষ্টা করবে তার কথাবার্ত্তায় কোন আতঙ্ক বা অহেতুক কৌতূহল কিংবা ব্যগ্র ভদ্রতা প্রকাশ না পায়।

পোষাক দেখে মনে হোলো, দুজন জার্মানের একজন মেজর ও অপরজন ক্যাপ্‌টেন। মেজরের বয়স প্রায় বত্রিশ আর ক্যাপ্‌টেন পঞ্চাশের কোঠা প্রায় ছাড়িয়ে এসেছে। দুজনেই আর্মচেয়ারে বসেছিল। চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে এক পায়ের উপর আর এক পা তুলে মেজরের বসবার ভঙ্গী দেখে বোঝা যায় তার বিশেষ কোন তাড়া নেই। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন একেবারে চেয়ারের ধারে সামনের

দিকে ঝুঁকে বসেছিল। বসবার ভঙ্গীতে কেমন একটা অসহিষ্ণুতা—যেন কোন কঠিন সমস্যার একটা দ্রুত মীমাংসা সে করতে চেষ্টা করছে। মেজর তার হাতের বেতটা নিয়ে খেলা করছিল। মেজর যদিও আজ পর্য্যন্ত কোন লোকের উপর তার এই বেতের শক্তি পরীক্ষা করেনি তবুও এই গোল মুণ্ডিওলা চকচকে মসৃণ ইস্পাতের বেতখানি সারা সহরে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

আরও নজরে পড়ে এই দুই খাঁটি ও নিখুঁত জার্ম্মান মেজর ও ক্যাপটেনের শারীরিক অসামঞ্জস্য।

ক্যাপ্‌টেনের খাঁটি টিউটন্ চেহারা, মাথার চুল ঘন, মুখের গড়ন চতুষ্কোণ, অত্যধিক মদ্যপানের দরুণ ফুলো ফুলো গাল, মোটা ভারি শরীর, তার টিউটনিক দৃষ্টিতে কিছুটা ভালোমানুষি আর কিছুটা চাপা নিস্পৃহতা, ধূর্ত্ততা ও বোকামিও।

আর মেজর সেই অনুপাতে রোগা। লম্বাটে মুখ, আত্মম্ভরী ব্যাস্তবাগীশ চালচলন। চোখের দৃষ্টি উদ্ধত ও রূঢ়, কিন্তু ভাবহীন।

এ্যালবার্ট যাদের পছন্দ করে না, তারা যদি তার সঙ্গে দেখা করতে আসতো তবে তাদের সঙ্গে দেখা করবার সময় সে কতগুলি বিশেষ ইঙ্গিত প্রকাশ করতো। ঘরে ঢুকে তাদের কোন অভিবাদন সে জানাতো না, নিঃশব্দে হাতের ইঙ্গিতে সে তাদের বসতে অনুরোধ করতো—যদিও তারা তার বলবার আগেই বসে পড়েছে। এইভাবে সে তাদের জানাতো, আসনে বসবার আগে গৃহকর্ত্তার অনুমতির জন্য তাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল এবং গৃহকর্ত্তা প্রচলিত ভদ্রতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে চান না ও সাক্ষাৎকার যথাসম্ভব-ক্ষণস্থায়ী হওয়া তার অভিপ্রেত।

জার্ম্মানদের সঙ্গে এ্যালবার্ট ঠিক এইভাবে দেখা করলো।

এইরকম অভ্যার্থনায় ক্যাপ্‌টেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। চেয়ার ছেড়ে তার শরীর অর্দ্ধপথে উঠেছে, এমন সময় মেজর তার হাতের বেতটা দিয়ে মেঝের উপর সজোরে আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্‌টেন চেয়ারের উপর আবার ধপ্ করে বসে পড়লো। ক্যাপ্‌টেন তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে দেখে মেজর খুসী হোলো এবং সোজাসুজি এ্যালবার্টের দিকে তাকালো। হঠাৎ ভ্যান্ একেন নিজের অজান্তে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে মেজরকে

অভিবাদন জানালো। মেজর উদ্ধতভাবে হাসলো এবং সেই অভিবাদনের কোন প্রত্যুত্তর দিল না। এ্যালবার্ট মনে মনে অনুভব করলো, সে তার শত্রুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রথম সংঘর্ষে তারই পরাজয় ঘটলো। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো যদিও সাধারণ বুদ্ধিতে তার মনে হচ্ছিল তার বসা উচিত।

মেজর বললো—তোমার সেই মিউজিয়ামে আমাদের নিয়ে চল। শুনতে পাচ্ছ তো?

এ্যালবার্ট জিজ্ঞাসা করলো—আমার কোন মিউজিয়ামে নিয়ে যাব?

মেজর আবার বললো—আমার কথাগুলি তোমার কানে ঢুকছে কি ঢুকছে না?

ভ্যান্ একেন ভয় পেয়ে গেল। সে এতদিন যা ভয় করেছিল তাই সত্য হোলো। জার্ম্মানরা নগরীর প্রাচীন সম্পদের উপর হাত দিতে উদ্যত হয়েছে। এ্যালবার্ট প্রথমে একটা টেবিলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো তারপর ধীরে ধীরে একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়লো।

—আমি তোমায় বসতে বলিনি। কথা বুঝি কানে ঢুকছেনা? মেজর একেবারে ফেটে পড়লো। আর এ্যালবার্ট হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে উঠে দাঁড়ালো। তার দিকে তাকিয়ে মেজর জোরে হেসে উঠলো, তারপর অত্যন্ত খোসমেজাজে ছড়ি ঘুরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কোন দিকে মিউজিয়াম, নিয়ে চল।

এ্যালবার্ট বললো—তোমরা কি করতে চাও? ওগুলো সব প্রাচীন স্মৃতি।

—ওগুলো কি? প্রাচীন স্মৃতি? মেজর তার খুসী-ভরা স্বরে কিছুটা অকপটতা আনতে চেষ্টা করলো। এ্যালবার্টের এই আতঙ্কিত ভাবটাকে মেজর রীতিমত উপভোগ করছিল।

এ্যালবার্ট চুপ করে রইলো। মেজর বললো—প্রাচীন স্মৃতি? শূয়োরও বোধ হয় এতটা বোকামি করবে না। আপনার নাম কি মহাশয়? মেজর টেনে টেনে হাসতে লাগল।

আর এ্যালবার্ট প্রতি মুহূর্ত্তে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার চোখে মুখে ভীতি ও আতঙ্ক ফুটে উঠলো। সেদিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন্ বললো—

হের ভ্যান একেন, শান্ত হোন্। আমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছি তা শুনলে আপনি খুসী হবেন। আর আপনার মিউজিয়াম যে আমরা দেখতে চাইছি, সেটা শুধুমাত্র কৌতুহল। আপনার এই সংগ্রহের জন্য আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছাড়া আর কোন মনোভাব আমাদের নেই।

*　　*　　*　　*

ভ্যান্ একেনের বাড়ীতে আসবার এক ঘণ্টা আগে মেজর ও ক্যাপ্টেন্ কথা বলছিল।

মেজর বললো—এ্যালবার্ট ভ্যান্ একেনকে ডেকে পাঠাও এবং আমার নামে তাকে এই আদেশ দাও যে···

কিন্তু ক্যাপটেনের মত অন্যরকম। সে ভ্যান্ একেনকে বুঝিয়ে স্বেচ্ছায় রাজী করাবার পক্ষপাতী।

অন্য সময় হলে মেজর কিছুতেই তার মত পরিবর্ত্তন করতো না। তার কারণ এই নয় যে মেজর অত্যন্ত অবুঝ, তার কারণ মেজর যুক্তি তর্কের বড় ধার ধারতো না। প্রথম যে কথা তার মাথায় ঢুকতো সেটাই সে কাজে ফলাতো, কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র, কারণ একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সেইদিন সকালে মেজর হেড্কোয়ার্টার থেকে একটা গোপন আদেশ পেয়েছে। আদেশের মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, স্থানীয় রেলওয়ে জংসনের সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত করে তুলতে হবে যেন সর্ব্বসময়ের জন্য সম্পূর্ণতম প্রস্তুতি তার থাকে। কারণ অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে সেনাবাহিনী দ্রুত স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু ঠিক এই সময়ে গত দু'তিন সপ্তাহ ধরে একটা গোপন ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। একদল "অজ্ঞাত লোক" "কম কাজ কর" এই আবেদন ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মেজর ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এই ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করে হেড-কোয়ার্টারের আদেশ দ্রুত পালন কিভাবে করা যেতে পারে। মেজরের ভয় ছিল, যদি সে এই কাজে সফল না হয় তবে তাকে সহরের এই রক্ষণার্থী সৈন্যদলের অধিনায়কের পদ থেকে অবসর দিয়ে পূর্ব্ব-রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেইজন্য সহকর্ম্মীদের উপদেশ শোনা সে যুক্তিসঙ্গত মনে করলো।

এমনকি ক্যাপ্টেন্কে যদিও সে পছন্দ করতো না, তবুও তার উপদেশ এইবার সে শুনলো।

মেজর জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা বেশ, তুমি কি করতে চাও? ভ্যান্ একেনকে প্রলুব্ধ করবে? সম্মান দিয়ে? অর্থ দিয়ে? সুখ সুবিধা দিয়ে? ও হচ্ছে একটা নির্ব্বোধ মালি। আমার মতে একটি মাত্র যুক্তি ওর ওপর কাজ করবে, তা হচ্ছে এই—ওরে ভ্যান্ একেন, পাজী শূয়ার, আমার কথায় যদি রাজী না হোস্, তবে ঐ মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কিন্তু ক্যাপ্টেন্ প্রতিবাদ করলো।

—মেজর, ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করবার পদ্ধতিকে তুমি বড় বেশী মূল্যদান করছ। লোকে যদি একবার ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে, তখন যে কোন ভীতি, এমন কি মৃত্যু ভয়েও আর কোন কাজ হয় না। তারা আরও বেশী একগুঁয়ে এবং আরও বেশী জেদী হয়ে ওঠে।

—কিন্তু ক্যাপ্টেন্, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে যুক্তিতর্ক দেখিয়ে ভ্যান্ একেনকে তুমি ধোঁকা দিতে পারবে?

—নিশ্চয়ই। যত দিন যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি—তোমার এবং আমার মধ্যে প্রভেদ শুধু বয়সের নয়, মতের ও চিন্তাধারারও। গত যুদ্ধের সময় আমাদের অভিজ্ঞতা বোধ হয় তোমার জানা নেই। সে সময়ে সাড়ে তিন বছর আমি অধিকৃত পশ্চিমাঞ্চলের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। প্রাচীন প্রুসিয়ার শাসন-পদ্ধতির পরীক্ষিত নিয়মগুলি অনুসরণ করে আমরা চমৎকার ফল লাভ করেছিলাম। এই পদ্ধতির কার্য্যকারিতা সম্পর্কে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, মেজর। কিন্তু তোমার কাছে এই পদ্ধতি কি ভাবে বর্ণনা করব? যদি একটা আধুনিক শব্দ ব্যবহার করি, তবে এই পদ্ধতিকে আমি বলব "সর্ব্বমুখীন্ চাপ"। "সর্ব্বমুখীন" না বলে "সংশ্লেষণী" চাপও বলতে পার। এর আসল কথা কি জান? বিভিন্ন উপায় এক সাথে প্রয়োগ করে, পথের সমস্ত বাঁধা তুচ্ছ করে, নির্ভয়ে যদি অগ্রসর হও—তবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হবে। একটি মুহূর্ত্তের ভিতর তোমাকে বিভিন্ন অস্ত্র একসাথে ত্যাগ করতে হবে। ভয় এবং ভালোবাসা,

খোসামোদ এবং অপমান, সারবান বক্তৃতা এবং জান্তব গর্জ্জন, বন্ধুত্বের ভরসা এবং শাস্তির ভীতি—সব একই সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। গীতিকাব্য আনো, সুকুমার হও, সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ঘৃণা প্রকাশ করো। আসল কথা হচ্ছে, সব কিছুর এককালীন উপস্থিতি। একই সময়ে সব ক'টি চাবিতে তুমি আঘাত করছ, ফলে সবক'টি পর্দায় সবক'টি সুর একসাথে আলোড়িত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়ে উঠছে। একসাথে শীত ও উত্তাপের সৃষ্টি করো। সমস্ত বিরুদ্ধ মনোভাব একযোগে আত্মপ্রকাশ করুক। তোমার বন্ধুত্ব ও তোমার ঘৃণা এক তারে ঝঙ্কার তুলে উঠুক। যখন এই সমস্ত কিছু একসাথে মিশে দুঃস্বপ্নের মত দানা বেঁধে উঠবে, তখন তোমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে। বুঝতে পারছ মেজর ?

কিন্তু মেজর বুঝতে পারছিল না। মেজর শুধু নিজেই যুক্তিতর্কের ধার ধারতো না তা নয়, অপর কারও মুখেও সেটা সহ্য করতে রাজী ছিল না। তা ছাড়া মেজরের ভয় ছিল, এবার ক্যাপ্‌টেন যুদ্ধের পূর্ব্বে তার লেখা একটি বিজ্ঞান-সম্পর্কিত বইয়ের উদ্ধৃত অংশ শোনাতে চেষ্টা করবে। অবশ্য ক্যাপ্‌টেনের মতে তার লেখা সেই বই গুপ্ত পুলিসের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। বইটার নাম—"পরীক্ষার্থীর উপর সর্ব্বমুখীন্ চাপ। রাইখের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে নিম্নজাতিসমূহের ইচ্ছাশক্তি ধ্বংস করবার ও মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে শিক্ষা দান করবার বাস্তব উপায়।" বইখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা দু'শ কুড়ি। এর মধ্যে প্রথম সাঁইত্রিশ পাতা আরব সংখ্যায় চিহ্নিত করা। এই অংশে ক্যাপ্‌টেনের নিজের লেখা ও লেখা বইয়ের উদ্ধৃতাংশ রয়েছে। বাকী ১৮০ পৃষ্ঠায় রোমান্ সংখ্যা ব্যবহার করা হয়েছে। এই অংশে তিনটি ভাগ আছে। (ক) যে সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বা অংশ উদ্ধৃত হয়েছে তার তালিকা, (খ) নামের ইন্‌ডেক্স, (গ) বিষয়বস্তুর বর্ণনাক্রমিক সূচী (ঘ) ছবি ও ছক্।

মেজর বললো যে, সে ক্যাপ্‌টেনের কথা বুঝতে পেরেছে এবং ক্যাপ্‌টেনের কথাই যে সত্য এ-সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ আর নেই। মেজর ঠিক করলো, ক্যাপ্‌টেন যদি তার এই "সর্ব্বমুখীন্" চাপের পরীক্ষায় সফল হয় তবে সে একদিন

তাকে বেলজিয়ামের সব চেয়ে নাম করা মদের দোকান থেকে সংগৃহীত ভাল ওয়াইন্ দিয়ে আপ্যায়িত করবে।

ঠিক তাই ঘটলো। মেজরের কথা শুনে ক্যাপ্টেন্ কিছুটা 'গ্র্যাভ্' দিয়ে যাবার জন্য আদেশ দিল। 'গ্র্যাভ্' হচ্ছে এক রকম সাদা ওয়াইন্।

ক্যাপ্টেন্ বললো—গত যুদ্ধের সময় যখন আমরা এই দেশ অধিকার করি, তখন থেকেই আমি 'গ্র্যাভ্' পছন্দ করি। মন্স্ নামে একটা জায়গায় এক ব্যবসায়ীর বাড়ীতে আমি ছিলাম। ব্যবসায়ীটি 'বারগ্যাণ্ডি' খুব ভালবাসত এবং ফ্রান্স থেকে অর্ডার দিয়ে জিনিষটা আনাতো—বাজারে বিক্রী করবার জন্য নয়, তার নিজের জন্য। তার বাড়ীতে আমরা এই জিনিষের অনেকগুলি বোতল খুঁজে বার করেছিলাম। তারপর থেকেই আমি এই মত পোষণ করি যে, সাদা মদের মধ্যে 'গ্র্যাভ্' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পানীয়টি তেলের মত ঘন ও ভারি এবং বসন্তের ফুলের মত একটি মৃদু গন্ধ তাতে আছে। শরতকালের সূর্য্যাস্তের মত সোনালী এর স্বাদ এবং পঁয়ত্রিশ বছরের একটি বলিষ্ঠ অচঞ্চল মেয়ের প্রেমের মত উত্তেজক।

—ক্যাপ্টেন্, তুমি সত্যি একজন কবি।

—প্রিয় বন্ধু, ঠিক তাই। আমার মনে হয় আমার ভিতর একটা কবি প্রতিভা আছে।

মেজর তার গ্লাশে ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করতে করতে একটা অর্থহীন হাল্‌কা গান গেয়ে উঠলো। তারপরে তারা দুজনেই হেসে উঠলো। 'গ্র্যাভ্' পান করবার পর তারা ঠিক করলো ভ্যান্ একেনের সাথে কথা বলবার সময় তারা দুজনে দুই বিভিন্ন ভূমিকার অভিনয় করবে।

* * *

মেজর ও ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে করে এ্যালবার্ট তার মিউজিয়ামে ঢুকলো

মেজর বললো—ঘরটা বড় অন্ধকার।

এ্যালবার্ট সুইচ্ টিপে আলো জ্বাললো।

মেজর চারদিকে দৃষ্টিপাত করে তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাকুনি দিল।

—সব বাজে জিনিষে ঘর ভর্ত্তি। যেমন ধর এই জিনিষটা—এগুলি তুমি কোন

জাতের বানর বলো? বানর যদি না হয় তবে কি? ডাইনি? গণিকা? এগুলো কি আমি জানতে চাই।

—এ'দুটো সেণ্ট জ্যাষ্টিনের গীর্জ্জার প্রথম ব্যালকনির দুটো কল্পিত মূর্ত্তি।

—ওদের মধ্যে একটার নাক নেই কেন? ওর কি সিফিলিস্ হয়েছে?

—একটি জার্ম্মান সৈন্যের গুলিতে ওর নাক উড়ে গেছে।

—দেখ, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি—জার্ম্মান সৈন্যদের সম্পর্কে বাজে কথা বোলো না।

কথা বলতে বলতে মেজর সেই ভালুক ও তার শাবকের মূর্ত্তিটার দিকে এগিয়ে গেল।

—এ জিনিষটা তবু একটু ভাল। কিন্তু ভালুকটা ওর থাবা এ'রকম উঁচিয়ে আছে কেন?

—ও ওর বাচ্চাগুলিকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়।

—কে ওকে আক্রমণ করতে চায়?

—বোধ হয় কোন শত্রু।

—কোথায়? আমিতো কোন শত্রু দেখছি না। যে লোকটি এ জিনিষটা তৈরী করেছিল, সে একটি বোকা।

—এই মূর্ত্তিটি চারশো বছরের পুরানো, কাঠ খোদাই করে তৈরী।

—তাহলে আরও খারাপ। কিন্তু একটু অপেক্ষা কর, আমি এই জিনিষটা সময়ের উপযুক্ত করে তুলছি

মেজর তার পকেট খুঁজে খুঁজে একটা বিচিত্র ছবি বার করলো এবং সেটা সেই ভালুকের উর্দ্ধোত্থিত থাবায় আটকিয়ে দিল। তারপর সে কিছুক্ষণ প্রশংসার দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে উঠলো। ক্যাপ্টেনও জোরে হেসে উঠলো।

নিজের বুদ্ধিতে নিজেই চমৎকৃত হয়ে মেজর এ্যালবার্টের দিকে তাকালো। এ্যালবার্ট তাকে প্রশংসা করবে—মেজর মনে মনে এই আশা করেছিল। এ্যালবার্ট মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তবুও জোর করে একটু হাসলো। মেজর অত্যন্ত খুসী হোলো এবং এ্যালবার্টের পিঠ চাপড়িয়ে বললো—তোমাকে

দেখে মনে হচ্ছে তুমি বোকা কিংবা খারাপ লোক নও। তোমাকে আমি নগর-প্রধান করবো। শুনতে পাচ্ছ তো ?

প্রস্তাবটি এত অপ্রত্যাশিত যে এ্যালবার্ট ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এবং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলো না। ক্যাপটেন এবার কথা বললো—নগর-প্রধানের পদ গ্রহণ করবার প্রস্তাব নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি।

এ্যালবার্ট চুপ করে রইলো। মনে মনে সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলো যেন শব্দ না বার হয়, চিন্তা না করে অবিবেচকের মত কোন কথা না বলে, অনিচ্ছাকৃত কোন হাসির রেখা তার মুখে ফুটে না ওঠে।

মেজর আবার বললো—আমাদের কথা কানে ঢুকছে তো ? আর একথাও শুনে রাখ, কুকুর, শূয়ারের বাচ্চা, যদি আমাদের কথায় রাজী না হোস্, তবে এইসব আবর্জ্জনা শুদ্ধ তোকে একেবারে গুঁড়ো করে ফেলব। আমার কথার নড়চড় হয় না।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মেজর তার হাতের ষ্টিলের ছড়িখানি ঘুরিয়ে এনে তার ভারী মাথাটা দিয়ে জোরে আঘাত করে কাঠের মূর্ত্তিটার একটি বাচ্চা ভালুকের মাথা ভেঙ্গে ফেললো। তারপর ভ্যান্ একেনের দিকে দ্রুত এগিয়ে এসে ঠিক তার নাকের তলায় ছড়িটাকে তার মাথা সমেত দোলাতে লাগল।

এ্যালবার্ট ধীরভাবে উত্তর করলো—আমি রাজী নই।

—রাজী নও ?

ছড়িটা দিয়ে বাতাসে আঘাত করতে করতে মেজর দু'পা পিছিয়ে এলো। সেই অননুভূত আঘাতের বেদনা এ্যালবার্ট যেন অনুভব করলো। সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে এ্যালবার্ট বুকের উপর দুহাত ভাঁজ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, যদিও সে বুঝতে পারছিল না, মেজর যদি তাকে আঘাত করে তবে সে কি করবে। মেজর কিন্তু তাকে আঘাত করলো না, অল্প একটু হেসে বললো—আচ্ছা বেশ, এইবার ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়াও।

আর সেই হাসি দেখে এ্যালবার্ট কেঁপে উঠলো। ক্যাপ্টেনকে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এ্যালবার্টের ভয় আরও বেড়ে গেল।

—আমার দিকে আরও কাছে এগিয়ে এসো।

এ্যালবার্ট একপা একপা করে অগ্রসর হোলো, আর তার মনে হোলো অন্তহীন উপত্যকা-পথে সে নেমে চলেছে। কোন শব্দ না করে, কোন রকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে মেজর এ্যালবার্টের হাত ধরলো, তারপর তাকে সঙ্গে করে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

—এইবার তোমার, বাড়ীর অন্যান্য সম্পত্তি যদি আমরা দেখতে চাই, তবে তোমার বোধ হয় কোন আপত্তি হবে না। ধর, তোমার বৌদির কথা যদি আমরা বলি, কি বল ভ্যান্ একেন? আর যদি তুমি আপত্তি কর, তবে তোমার জন্য কি অপূর্ব্ব আনন্দলাভের ব্যবস্থা আমরা করব সেটা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবেনা। সেই তালিকা কি তুমি আমাকে পড়ে শোনাতে বল? সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—একটির পর একটি? আমি জানি, তোমার জন্য আমরা যে ব্যবস্থা করব আগাগোড়া সবটা যদি তোমায় বলি, তুমি অত্যন্ত খুশী হবে।

এ্যালবার্ট কোন কথা বললো না। একহাতে এ্যালবার্টকে ধরে মেজর আগে আগে চলতে লাগল আর এ্যালবার্ট অনুগতের মত পিছনে পিছনে চললো।

ঠিক এই সময়ে ম্যারিক সিঁড়ির পিছন দিক হতে হঠাৎ বার হয়ে এলো, তারপরেই বারান্দার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—ঐ সুন্দরীটি কে? বোধ হয় আমি এতক্ষণ যার সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করছিলাম, তিনিই স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। আর ভ্যান্ একেন, তুমি যদি গোঁয়ার্ত্তুমি করে আমার কথা না শোন, তবে ওর ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন।

এ্যালবার্টের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে মেজর বারান্দা পার হয়ে যে ঘরের ভিতর ম্যারিক ঢুকেছে, সেই ঘরে ঢুকলো।

এ্যালবার্ট বললো—ওটা একটি মহিলার ঘর।

—বাঃ আরও সুন্দর। চল ক্যাপ্টেন ভিতরে যাই। ঘরটির সঙ্গে সঙ্গে ঘরটির অধিকারিণীকেও দেখা যাবে।

তারা দুজন প্রথমে ঢুকলো, এ্যালবার্ট তাদের অনুসরণ করলো। তারা দেখলো, ঘরের ভিতর কেউ নেই। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার অপর দরজাটির পানে এ্যালবার্ট একবার তাকালো।

—মহিলাটি চলে গেছেন দেখছি। যাকগে, সে জাহান্নামে যাক্‌, কিন্তু ক্যাপ্‌টেন ঘরটি সত্যিই লোভনীয়। এরকম ঘরে আমরা বহুদিন ঢুকিনি, না ক্যাপ্‌টেন? প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছো তো? মহিলাটি কে?

—আমার দাদা ম্যাথু ভ্যান্‌ একেনের স্ত্রী।

—তাহলে আমি ভুল করিনি। তার নাম কি?

—ম্যারি।

—কত বয়স?

—উনচল্লিশ।

—বাঃ, বেশ উপযুক্ত বয়স। ক্যাপটেন কথাটা লিখে রাখ, ভুলে যেও না। তোমার কি মনে হয়? কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, সে আমাদের ভবিষ্যত নগর-প্রধানের আত্মীয়া। তা যদি না হোত, তবে সে এখন ট্রা-লা-লা সুরে একটা হাল্‌কা গান ধরতো, একটু নাচতোও নিশ্চয়ই। তোমার কি মনে হয় প্রধান? সে কি একটু নাচবে না? এটা কি তার ছবি? চোখের দৃষ্টি সার্থক করো ক্যাপ্‌টেন, তুমি তো মেয়েদের দেখেই বুঝতে পারো।

—মেজর তাকিয়ে দেখ, কি ভরাট দেহ অথচ কি সুন্দর আর কি হালকা। একটা নিটোল সৌন্দর্য্য আর প্রাণ-প্রাচুর্য্য সারা দেহে ফুটে রয়েছে। কিন্তু দেহের কোথাও মাংসপিণ্ড ভারী হয়ে ওঠেনি, প্রতি মাংসপেশী শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। ওর মন অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ওর প্রণয়ীর সাথে ও ককেটিশের মত ছুটাছুটি করতে পারে। আর গায়ের রং দেখ—পদ্মের মত সাদা। গায়ের চামড়া নিশ্চয়ই ভেলভেটের মত নরম। মাথার চুলে কি সুন্দর সোনালী আভা। তারপর পা দুটি! মেয়েদের পা এত শক্তিশালী, এটা একটা বিস্ময়ের বস্তু—কিন্তু তবু মোটেও খাড়া ও সরু নয়, আর কি সুন্দর দীর্ঘতা, আর কি চঞ্চল ও চটুল। আর কি উন্নত নিতম্বদেশ! বিশেষ করে মেয়েদের দীর্ঘ পা আমি পছন্দ করি। আর মেজর তাকিয়ে দেখ ওর কোমরের দিকে। কি রকম স্পষ্ট কটি-রেখা, প্রায় কাঁধের নীচ থেকেই সুরু হয়েছ বলা চলতে পারে।

—ক্যাপ্‌টেন, তোমার কথার সুর ভাল মনে হচ্ছে না। সে যাই হোক, তুমি

লোকটি ভারি চমৎকার। শুধু দুঃখের কথা এই, তুমি বুড়োটে হয়ে গেছ। আর একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, এখানে বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে চেষ্টা কোরো না। অন্যের হাতে ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকো।

ক্যাপ্টেন কুটিল দৃষ্টিতে মেজরের দিকে তাকালো, কিন্তু একটি কথা বললো না। মেজর টেবিলের উপর থেকে একটা বই তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—স্ত্রীলোকটি কি বই পড়ে? ফারহিরেন্? কবিতা!

—মেজর, ওটা 'ফ' নয় 'ভ', আর ফ্লেমিশ ভাষায় ওর উচ্চারণ 'ই' নয় 'আ'—ওটা হবে ভারহার্ণ।

—তুমি হঠাৎ এত অভদ্র হয়ে উঠলে কেন? আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি? যা লেখা আছে, তাই আমি পড়ছি—ফারহিরেন্।

কথাটা বলে মেজর এ্যালবার্টের হাত ধরে বেরিয়ে চলে এলো।

—যাক্ আমরা যে বিষয়ে আলোনো করছিলাম, সেই কথায় ফিরে আসা যাক। শোন ভ্যান্ একেন, আমি তোমাকে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে দেখবার জন্য কিছু সময় দেব। ও ঘরে জড় করা ঐ সব প্রাচীন স্মৃতি ও এ ঘরের এই জীবন্ত মূর্ত্তিটির কথা ভুলে যেও না। আর একথাও তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, যদি তুমি নগর-প্রধান হতে রাজী না হও, তবে তোমার প্রিয় জীবিত ও মৃত কোন কিছুই আমার হাতে রেহাই পাবে না, কিন্তু আমার আর এসব এখন ভাল লাগছেনা, ক্যাপ্টেন এরপর তোমাকে বুঝিয়ে বলবে কেন আমরা তোমাকে চাই, আর তোমাকে কি করতে হবে।

সদর দরজার সামনে এসে মেজর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো—ক্যাপ্টেন কোথায়?

কিন্তু ক্যাপ্টেনকে সেই হলের ভিতর দেখা গেল না। মেজর ও এ্যালবার্ট যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তখন সে আবার ম্যারির ছবির দিকে এগিয়ে গেল এবং সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঠোঁট দিয়ে চুক্ চুক্ শব্দ করতে করতে বাসনা বিহ্বল আবেগে দু'হাত প্রসারিত করে অত্যন্ত লোভীর মত সেই ক্যান্ভাসে হাত বুলোতে লাগল।

হঠাৎ সে পায়ের শব্দ শুনলো। ঘরের ওপাশের ছোট দরজা দিয়ে কে যেন

প্রবেশ করলো। ক্যাপটেনের মনে হোলো কে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে ফিরে দাঁড়ালো।

দেখলো, তার সামনে ম্যারি দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ নির্জ্জনে সে যে কামনায় অন্ধ হয়ে উঠেছিল, তার প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারলো না। ম্যারির দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে সে অত্যন্ত কদর্য্য একটা ইঙ্গিত করলো।

তার সেই ক্লেদাক্ত ও অপমানজনক হাসি দেখে ম্যারি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পূর্ব্ব-পরিচিত অত্যন্ত বীভৎস আর একটা হাসির কথা তার মনে পড়ে গেল।

এই কি সে? এমন কি হতে পারে? ম্যারি ভয় পেয়ে মনে মনে ভাবলো।

—কি? কি? তুমি কি কিছু বলতে চাও? ক্যাপ্‌টেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

ম্যারি তার হাত তুললো—এবং সহসা ক্যাপ্‌টেনের মুখে চপেটাঘাত করলো। তার চোখের দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ছিল।

ক্যাপ্‌টেন্ ভয় পেয়ে ছুটে বাইরে চলে এলো।

হলঘরে এসে সে আবার সাহস ফিরে পেল। যখন সে দেখলো মেজর চলে যাচ্ছে, তখন সে আস্তে আস্তে চলতে লাগল, যেন মেজরের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ না হয়; তার গালদুটো তখনও জ্বালা করছিল। তার হঠাৎ মনে হোলো ম্যারিককে যেন সে এর আগে অন্য কোথাও দেখেছে, কিন্তু কোথায় ও কখন সেটা কিছুতেই মনে করতে পারলো না। যতই সে ভাবতে লাগলো, ততই সমস্ত ধারণা অস্পষ্টতর হয়ে উঠলো এবং মনে মনে সে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

মেজর কোন দিকে ফিরে না তাকিয়ে চলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে এ্যালবার্ট দেখলো বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর মোতায়েন দুজন সৈনিক মেজরকে স্যালুট করে দাঁড়ালো। মেজর হাতের ইঙ্গিতে তাদের স্থানত্যাগ করতে নিষেধ করলো।

* * *

ক্যাপ্‌টেন বললো—হের ভ্যান্‌ একেন, এবার আপনার সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই।

এ্যালবার্ট উত্তর করলো—এর পর আর কোন কথা বলবার আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি আপনার অধিনায়ককে বলেছি, শত্রু অধিকৃত ও পরিবেষ্টিত দেশে নগর-প্রধান হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। আপনি যা খুসী করতে পারেন।

—হের ভ্যান্‌ একেন, আপনি সংক্ষেপে সোজাসুজি কথা আরম্ভ করেছেন দেখে আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি। অবশ্য আপনাকে বলতে হবে না যে, নিজের পথ বেছে নেবার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। আপনাকে না পেলে জনসাধারণ অন্য যাঁকে চাইবে তাঁকেই আমরা নগর-প্রধান করব। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর নিরাপত্তার খাতিরে আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।

—হের ক্যাপ্‌টেন, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি সেজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।

—চোরাই মাল সমেত আপনাকে হাতে হাতে ধরা হয়েছে, সুতরাং চুরির অপরাধে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে।

—আমি কোন জিনিষ চুরি করিনি।

—আপনি এই নগরের সাধারণ সম্পত্তি চুরি করেছেন।

—একথা একজন লোকও বিশ্বাস করবে না।

—এই সহরের এখানে ওখানে দু'একজন লোক একথা বিশ্বাস না করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা সত্য বলে গ্রহণ করবে; লোকে যাঁকে শ্রদ্ধা করে তাঁর নামে যদি চুরির অভিযোগ আসে, তবে সেটা তারা অত্যন্ত সহজেই বিশ্বাস করে বসে।

—এইবার বুঝতে পারছি। শত্রুকে বলি দেবার পূর্ব্বে তার কপালে কলঙ্কের ছাপ পড়ুক।

—বলি! একথা আপনাকে কে বললো? আপনার মাথার একটি চুলও স্পর্শ করা হবে না। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যে উপায়ে চোর ও অন্যান্য দোষীদের শাস্তি দিতাম, যুদ্ধের সময়েও আমরা তার এতটুকু পরিবর্তন করিনি। বন্দী

অবস্থাতেও আপনাকে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে এবং নিজের টাকা খরচ করবার অধিকার আপনার থাকবে।

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্‌টেন হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো—ঠিক, ঠিক। সমস্ত মিলিয়ে একটা অত্যন্ত সুন্দর জিনিষ হবে। খবরের কাগজ মারফত জনসাধারণকে আমরা জানাবো, চুরির অপরাধে আপনাকে আটক রাখা হয়েছে এবং আপনার জন্য অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর আদালতের বিচারে আপনার পাঁচ বৎসর জেল হবে, এবং তারপর—এ জায়গাটা ভাল করে শুনুন—তারপর আমরা আপনাকে বেকসুর খালাস দেব। ঘটনার এই পরিণতি কেউ আশা করে নি। আমরা জানাবো, জার্ম্মান সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাহায্য দান করবার জন্য আপনাকে ক্ষমা করা হোলো। এখন আপনি নিজেই বিচার করুন—আপনি এই সহরের মেয়র হোন বা না হোন, আপনার সাহায্য আমরা পাই বা না পাই, এ ঘটনার পর আপনার বন্ধুবান্ধবরা আপনাকে আমাদের মুখপত্র বলেই মনে করবে। কিন্তু চুরির অপরাধে একবার দণ্ডিত হবার পর এই সহরের মেয়রের পদে আপনি আর নিযুক্ত হতে পারবেন না। চুরির অপরাধ বৈকি—নিশ্চয়ই।

ক্যাপ্‌টেন হাসলো। এবার আর জোর করে হাসি নয়, গভীর সন্তোষের হাসি—তার নিজের স্কিমের প্রতি ও প্রুসিয়ান শাসনপদ্ধতির প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধার হাসি।

এ্যালবার্ট কোন কথা বললো না, ক্যাপ্‌টেন্‌ বিজয়গর্ব্বে উদ্ধত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। মাথা নীচু করে এ্যালবার্ট আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা একবার ভেবে দেখল। তার মুক্তির পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি বিদ্যুতের মত পর পর তার চোখের সামনে ঝল্‌সে উঠলো। বন্ধুরা তাকে ঘৃণা করবে, সহরবাসী তাকে পরিত্যাগ করবে, আপনার লোকের কাছে নিজের অবস্থা পরিষ্কার করে সে ব্যাখ্যা করতে পারবে না, ভয়াবহ নির্জ্জনতায় তার মন ভেঙ্গে পড়বে এবং সকলের পরিত্যক্ত ও সকলের ঘৃণিত তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এ্যালবার্ট উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এই পাশবিক নীতির জয়লাভ হবে?

তার সমস্ত অতীত জীবনের গৌরবও যদি এই কলঙ্কের পাশে ম্লান হয়ে যায়, তবুও সে নিরাশ হবে না। এই জার্ম্মানটার গলা টিপে ধরছে না কেন সে? জার্ম্মানরা তাদের প্ল্যান কার্য্যকরী করে তুলবার আগেই তার মৃত্যু ঘটুক। এই মুহূর্ত্তে, প্রস্তুত হবার কোন সুযোগ না দিয়ে সে এই বর্ব্বর ক্যাপ্‌টেনকে পিশে ফেলবে।

এ্যালবার্ট তার মাথা তুলে নির্ভীক দৃষ্টিতে ক্যাপ্‌টেনের দিকে সোজাসুজি তাকালো। একটা শান্ত হাসির আভায় তার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অকৃত্রিম ঘৃণা ও অটল বিশ্বাসে সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো ক্যাপ্‌টেন বুঝলো, তার প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। তবুও এ্যালবার্ট কি বলে শুনবার জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু এ্যালবার্ট একটি কথা বললো না। একটা শান্ত আত্মবিশ্বাসে সে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ক্যাপ্‌টেন হাতের ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললো।

—হের ভ্যান্ একেন, আমি এতক্ষণ শুধু ঠাট্টা করছিলাম। কোন অসাধু উদ্দেশ্য আমাদের নেই। জনসাধারণের মধ্যে আপনার যে সুনাম ও কর্ত্তৃত্ব আছে, সেটা আমরা আমাদের কাজে লাগাতে চাই। আমি আপনাকে আরও কিছু বলবো। একজন নির্ভীক সৎসাহসী ও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি হিসাবে আপনার যে সুনাম গড়ে উঠেছে, সেটা আমাদের ইচ্ছাকৃত চেষ্টার ফল। আমরা জানতাম আপনি এই সহরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি সংগ্রহ করে রাখছেন। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে না জানার ভান করলাম। রাউণ্ড টাওয়ারের কাছে আপনার গতিবিধির উপর আমার কর্ম্মচারী সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনা রীতিমত নজর রাখতো। তারপর আমার আদেশে আপনাকে কোন শাস্তি না দিয়ে ওয়াচম্যানের সাহায্যে শুধু ভয় দেখানো হোলো। আমারই আদেশে মাগুনা সহরের নানা লোকের কাছে নানা প্রসঙ্গে আপনার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগল এবং আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা শুনে বিস্মিত হবার ভাব দেখালো, সহরবাসীকে আমি এই কথা বলাতে চেয়েছিলাম—'ভ্যান একেনকে দেখ, কি নির্ভীক স্বাধীন মানুষ। এমন কি জার্ম্মান অধিনায়করাও তাকে সম্মান করে চলে।' এমন নির্ব্বোধ হয়ত অনেকে আছে যারা বলবে আপনার উপর এত ভরসা রেখে আমি ভাল কাজ করিনি, একথাও তারা বলতে পারে যে, আমি আন্দোলনকারী

দালালের মত কাজ করেছি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে আমি কোন কিছু ভুল করেছি বলে আমি মনে করি না। আপনি সত্যিই একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, নিস্বার্থ, মহত ও সম্মানের যোগ্য। আপনাকে আমাদের সত্যিই প্রয়োজন। আমি একথা সব সময়ে বলবো যে, আপনাকে আমাদের যেমন প্রয়োজন, তেমনি আমাদেরও প্রয়োজন আছে।

সমস্ত কথা খোলাখুলি জানতে চান? কথা বলবেন না? বেশ, তবুও আমি বলবো। মেজর শীঘ্রই এ সহর ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু আমি থাকবো। আমাদের সেনাবাহিনীর একাংশ আমরা কিছু সময়ের জন্য পূর্ব্ব-রণক্ষেত্রে পাঠাতে চাই। 'হয়ত নাও পাঠাতে পারি। এটা কার উপর নির্ভর করে জানেন? আপনার উপর—আপনি, হের ভ্যান্ একেন। আমরা এই সহরে এমন একজন মেয়র চাই যার কর্ত্তৃত্ব কেউ অস্বীকার করবে না, যার আদেশ শ্রদ্ধার সাথে প্রতিপালিত হবে। কি রকম চাই জানেন? আপনার মত—যার শুধুমাত্র নাম শুনলেই সংশয়ী মন শান্ত হবে এবং লোকে বিশ্বাস করবে নিষ্ঠাশীল পরিশ্রম ও প্রতিবাদহীন আদেশানুবর্ত্তীতা ছাড়া আমরা আর কিছু চাইনা। আমাদের সাথে বন্ধুত্বের মূলসূত্র হচ্ছে এই। সেই বন্ধুত্বের আহ্বান আমি আপনাকে জানাচ্ছি। মনে রাখবেন, একমাত্র বন্ধুত্বের সর্ত্তে সহরে অবস্থিত বাহিনীর ক্ষুদ্রতা সম্ভব। সে বাহিনী যত ক্ষুদ্রতর হবে, যুদ্ধ-কর তত কম হবে, বিধিনিষেধের কড়াকড়ি তত হ্রাস পাবে এবং সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যের পরিমাণ তত ছোট হবে। সহরে অধিকতর শান্ত অবস্থা ফিরে আসবে। এতে আমাদের কোন স্বার্থ নেই, আপনারাই শুধু উপকৃত হচ্ছেন। আপনাকে আরও বলতে পারি, দু'তিন সপ্তাহ পর যখন মস্কো অধিকৃত হবে এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মত রাশিয়ানরাও আত্মসমর্পণ করবে, সে বাহিনী আপনার এই সহরে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু আপনি যদি সহরে আপনার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তবে তাদের ফিরে আসবার আর কোন প্রয়োজন হবে না। সহরের পক্ষে সেটা খুবই ভাল হবে। তারপর যখন জার্ম্মানীর রক্ষণাধীনে সাধারণ শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে তখন আপনি দেখবেন, এই যুদ্ধের ফলে আপনার নিজের দেশ সর্ব্বাপেক্ষা কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কার উপর এ সমস্ত কিছু

নির্ভর করছে? কে? কে? কে? হের ভ্যান্ একেন, সে লোক আপনি নিজে, আপনি, আপনি, আপনার উপর নির্ভর করছে। যদি আপনি সহরের শৃঙ্খলা, শান্তি, নিয়মানুবর্ত্তীতা, কর্ম্ম-ক্ষমতা ও জার্ম্মানীর প্রতি আনুগত্য রক্ষা করতে পারেন, তবে আমি বলতে পারি আপনি যেদিন হতে মেয়রের পদ গ্রহণ করবেন সেইদিন হতে সব কিছু অত্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে। আপনার জন্য আমি সব কিছু করতে রাজী আছি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, এই মুহূর্ত্তে আমি আদেশ দিচ্ছি "আণ্ডার দি সোয়ালোস্ উইংগ" সরাইখানা থেকে সমস্ত সৈন্য স্থানান্তরিত হবে। আর কি কি চান বলুন, আমি সর্ব্ব বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করব।

এ্যালবার্ট না হেসে থাকতে পারলো না।

—হের ক্যাপ্টেন, অন্য জার্ম্মানদের মত আপনিও অত্যন্ত অকুশলী কূট-নীতিক। আপনি কি সত্যি ভাবেন যে আমি বুঝি না কেন আপনি প্রথমে আমাকে ভয় দেখালেন এবং তারপরেই বন্ধুত্বের প্রস্তাব করছেন?···এটা একই নীতির বিভিন্ন অংশ মাত্র।

—এবং এই নীতি হচ্ছে সত্য ও যথার্থ নীতি। ক্যাপ্টেন খুশী হয়ে এ্যালবার্টের কথা অনুমোদন করলো,—কিন্তু একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের উপর এই নীতি আমি প্রয়োগ করি। আপনি কি চান, আপনার উপর চাবুক ব্যবহৃত হোক, রাইফেলের বাঁটের আঘাতে আপনার পাঁজর গুড়ো হয়ে যাক, আপনার দাঁতগুলি ভেঙ্গে ফেলুক, মাথার থেকে চুল উপড়ে নিক? আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, এসমস্ত জিনিষের বীভৎসতা আপনি কল্পনাতেই অনুভব করতে পারবেন এবং নিজেকে নিরর্থক দুর্ভোগের ভিতর টেনে নিয়ে যাবেন না। হ্যাঁ ভাল কথা, যদি আপনি ইচ্ছা করেন···

—হের ক্যাপ্টেন্, আপনার প্রতিভার বৃথা অপপ্রয়োগ হচ্ছে। আপনি যাকে চান, সে আমি নই।

—বেশ ভাল কথা। আমরা দুজনেই দুজনকে বুঝতে পারলাম। আপনার ও আমার ভিতর কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। আমি সমস্ত রিপোর্ট হের মেজরের কাছে দেব। আমরা কোন রকম মীমাংসায় উপস্থিত হতে পারিনি শুনলে তিনি

অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তার মেজাজের সাথে আপনার ইতিপূর্ব্বেই পরিচয় হয়েছে। আপনি বরং আর একবার বিবেচনা করে দেখুন, আমি এক ঘণ্টার ভিতর আবার আপনার সাথে দেখা করব।

* * *

ক্যাপ্‌টেন্ চলে যাবার পর ম্যারি ও লুসাকে কোন কথা না বলে এ্যালবার্ট তার মিউজিয়ামে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ম্যাডোনার ছবির তলায় সে চুপ করে বসে রইলো। বহুক্ষণ সে এইভাবে কাটালো—কোন চিন্তা নেই কেমন একটা অস্পষ্ট ও অবোধ মনের অবস্থা। ম্যাডোনার নীল চোখদুটি তার দিকে তাকিয়ে রইল। অভিজ্ঞ লোকেরা বলে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হান্স মাম্‌লিঙ্ক এই ছবিখানি চিত্রিত করেন। ছবিখানি এ্যালবার্ট টাউনহল থেকে নিয়ে এসেছিল।

লোকে বলে এই নীল-চক্ষু ম্যাডোনার সাথে তার মা'র অনেক সাদৃশ্য আছে, তার মুখখানি বসন্তের প্রভাত-আলোর মত উজ্জ্বল, তার দেহের গঠন অপূর্ব্ব লাবণ্য-ময়ী, তার ঠোঁটে ভোগজয়ী মৃত্যুজয়ী গভীর ধ্যানের হাসি। সর্ব্ব দুঃখ দূর হবে এবং পৃথিবীতে গভীর আনন্দ ফিরে আসবে, এই বিশ্বাসে ম্যাডোনার চোখদুটি দ্যুতিমান। এ্যালবার্টের মার চোখেও এই রকম ধীর ও শান্ত আশার আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

* * * *

ক্যাপ্‌টেনকে আঘাত করবার পর ম্যারিক ছুটে লুসার ঘরে ঢুকলো।

—লুসা, তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করো!

—ম্যারিক, কি হয়েছে? তুমি এত বিবর্ণ কেন? মনে হচ্ছে মৃত্যুর মুখো-মুখি তুমি দাঁড়িয়েছিলে। ওদের সাথে কি তোমার কোন সংঘর্ষ হয়েছে?

—লুসা, দরজা বন্ধ করো। যদি সে আবার আসে, আমি হার মানবো না।

—তুমি কি বলছ ম্যারিক? তখনই তোমাকে বলেছিলাম, যেওনা যেওনা, কিন্তু তবুও তুমি গেলে।

—কিন্তু ওগুলো ওদের হাতে কি করে ছেড়ে আসি বলোতো? ওগুলি আমার সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ—রেণীর স্মৃতি।

—তুমি এত ভয় পেয়েছ কেন, ম্যারিক?

—ওঃ লুসা! বোধ হয় আমি প্রলাপ বক্‌ছি, বোধ হয় এটা সত্যি নয়—কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, আমার জীবনে যা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, তাই আমি দেখছি। কিন্তু না, আমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমি যা ছিলাম, এখন আর তা নই। আমি কখনও হার মানবো না।

অনেক প্রশ্ন করেও লুসা আর বিশেষ কিছু জানতে পারলো না। ম্যারিক বারবার জানতে চাইলো ঘরে কোন অস্ত্র আছে কিনা এবং লুসার ওষুধের বাক্সে কোন বিষ আছে কিনা। লুসা মনে মনে প্রার্থনা ক'রে এই শপথ করলো, যাই ঘটুক, ম্যারিককে সে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করবে।

উপরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে তারা দেখলো, প্রথমে মেজর চলে গেল, তারপর গেল ক্যাপ্‌টেন এবং সর্ব্বশেষে সৈনিকদুটিও চলে গেল।

তখন লুসা ও ম্যারিক ছুটে এলো। কিন্তু পড়বার ঘরে এ্যালবার্ট ছিল না। মিউজিয়ামের দরজায় তারা "নক্' করলো।

এ্যালবার্ট অনিচ্ছায় দরজা খুললো। লুসা ও ম্যারিককে সে জানাল—জার্ম্মানরা মিউজিয়াম্ দেখতে এসেছিল। এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সব কিছুর জন্য প্রস্তুত ক'রে তোলো।

—বেল-বেল! লুসা এ্যালবার্টের হাতের উপর লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—বেল-বেল, আমরা কি হেরে গেছি? আমরা কি হেরে গেছি?

এ্যালবার্ট ঘাড় নাড়লো—আমি জানি না, পিসীমা আমি কিচ্ছু জানি না।

ম্যারিক বললো—যদি ম্যাথু কিংবা রেণী এখানে থাকতো তবে তারা সব জানতে পারতো।

লুসা তার ভাইপোর হয়ে কথা বললো—আঃ ম্যারিক। রাজা তোমার ম্যাথুর চেয়ে অনেক কিছু বেশী জানতো, তবুও সে আত্মসমর্পণ করলো। এই গলাকাটা হূনের দলকে তাড়াবার ক্ষমতা বোধ হয় একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারও নেই। আমরা শুধু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করবো ও প্রার্থনা করবো আর আশা করবো।

বেল-বেল, আমাদেব অস্তিত্ব কি মুছে যাবে? সকলের সঙ্গচ্যুত ও পরিত্যক্ত হয়ে আমরা কি দিন গুনছি, কবে এই হিংস্র হাউণ্ডগুলো আমাদের টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলবে?

লুসা এ্যালবার্টকে জড়িয়ে ধরে রইলো, আর তার চোখের জলে তার গাল ভিজে উঠলো।

—লুসা, কেঁদো না। তোমরা দুজনেই আমার কথা শোনো। সাহস ও শক্তিতে ভর ক'রে উঠে দাঁড়াও। আমার মনে হয়, এই মুহূর্ত্তে তোমাদের এই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত,—যত দূরে সম্ভব ততদূরে। নইলে তোমরা নিজেদের ও আমার ধ্বংস ডেকে আনবে।

ম্যারিক উত্তেজিত হয়ে উঠলো—কি? পালাব? যেখানে যে কোন সময়ে রেণী কিংবা ম্যাথুর আসবার সম্ভাবনা, সেই বাড়ী ছেড়ে আমি পালাব? তুমি পাগল হয়ে গেছ, এ্যালবার্ট। না, আমি যাব না, কখনো নয়, কোন কারণে নয়। যে কোন মুহূর্ত্তে তাদের আমি আশা করছি। যখনই কোন করাঘাত, কোন চীৎকার, কোন পদধ্বনি আমার কানে আসে, আমার মনে হয়, ওরা কেউ আসছে। একবার ভেবে দেখ আমি এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাব, তারপর তারা ফিরে আসবে—পরস্পরকে কোথায় খুঁজে বার করবো সেটা পর্য্যন্ত জানা থাকবে না। আমি আমার স্বামী ও পুত্রের সন্ধানে পথে পথে ঘুরতে থাকবো আর আমার স্বামী ও পুত্রও আমাকে খুঁজে বেড়াবে। হয়ত একজনের চলা-পথ অনুসরণ করে আর একজন চলে যাবে, হয়ত এক এক সময় আমরা খুব কাছাকাছি আসব কিন্তু তবুও আমরা মিলিত হতে পারব না। না এ্যালবার্ট, আমি এখানেই থাকব এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করবো—যাই ঘটুক না কেন। এটা হচ্ছে একমাত্র স্থান যেখানে তারা আমার খোঁজে আসবে। আর কোন সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য ঠিক করতে না পার, তাহলে মনে মনে এই প্রশ্ন করো, ম্যাথু কিংবা রেণী হলে কি করতো? তুমিও ঠিক তাই করো। দেখবে সবকিছু তোমার কাছে সহজ ও সোজা হয়ে উঠবে।

ভ্রমণ ও পরিবর্ত্তনকে লুসা চিরকালই ভয় করতো, সে খুসী হয়ে ম্যারিককে

সমর্থন করলো—আমিও এই বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না। অন্য কোথাও গেলে আমি মরে যাব।

এ্যালবার্ট যখন নিজেকে আবার একা ফিরে পেল, তখন মনে মনে এই ভেবে তার দুঃখ হোলো যে জার্ম্মানদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সূচনাতেই সে তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কর্কশ ও বিরুদ্ধ সুরে কথা বলেছে। সে মনে মনে ঠিক করলো, এক ঘণ্টা পর ক্যাপ্‌টেন যখন আবার আসবে তখন সে তার প্রথমবারের প্রত্যাখ্যানকে নানা কৈফিয়ৎ দিয়ে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে কোমল করে তুলবে এবং তাদের সাথে সহযোগিতার প্রস্তাব তুলবে। এ্যালবার্ট যতই ভাবতে লাগল, ততই তার মনে হোলো—এমন যথেষ্ট কারণ আছে যার ফলে জার্ম্মানরা কিছুমাত্র বিরক্ত হবে না, বরং তাদের মনে হবে এ্যালবার্ট আগাগোড়া নিরপেক্ষ।

এক ঘণ্টা কেটে গেল—ক্যাপ্‌টেন্ ফিরে এলো না। এ্যালবার্টের মনে হোলো সমস্ত ব্যাপারটাই একটা খেলা। তারা চায় তার এই দ্রুত প্রত্যাখানের জন্য তার মনে একটা অনুশোচনা আসুক। একথা যখন সে বুঝতে পারলো, তখন তার এই মতিচাঞ্চল্যের কথা ভেবে সে লজ্জিত বোধ করলো। মনে মনে সে স্থির করলো, সে কখনোই পরাজয় স্বীকার করবে না।

দিন প্রায় শেষ হয়ে এলো—ক্যাপ্‌টেনের দেখা পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার সময় একটা জার্ম্মান ট্রাক্ বাড়ীর সামনে এসে থামলো। তারপর কে যেন সদর দরজায় ধাক্কা দিলো।

সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনা বাড়ীর ভিতর ঢুকলো এবং জার্ম্মান সেনা-নায়কের শীল-মোহরাঙ্কিত এক টুকরো কাগজ এ্যালবার্টের হাতে দিল। কাগজটাতে মেজরের সই ছিল; তাতে লেখা—

এই মর্ম্মে খবর পাওয়া গেছে যে, তুমি নগরের সম্পত্তি আপন অধিকার-ভুক্ত ক'রেছ ও তার অসদ্ব্যবহার ক'রেছ। আমার আদেশে তুমি সেই সমস্ত অপহৃত সম্পত্তি জার্ম্মান কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করবে। চুরির অপরাধে তোমার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয়েছে। বাড়ীর এলাকার বাইরে তোমার সমস্ত গতিবিধির উপর এখন হতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হোলো। সৈনিকদের উপর এই

আদেশ আছে যে, তুমি যদি এই আদেশের সামান্যতম প্রতিবাদ বা বিরুদ্ধতা করো, তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে গুলি করা হবে।

এ্যালবার্ট রীতিমত ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু বাইরে সে কিছু প্রকাশ করলো না।

সার্জেন্ট মেজরকে সে শান্তভাবে বললো—যা দরকার মনে হয় করো।

মাগুনা একজন সৈনিককে এ্যালবার্টের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবার আদেশ দিল।

—দেখো, যেন ও এই জায়গা ছেড়ে একপা না এগোয়। যদি সে চেষ্টা করে, তবে গুলি করবে। যদি ওকে মেরে ফেলতে পার, তবে তোমাকে এক গ্লাস ভাল ফরাসী মদ দেওয়া হবে। আর ওহে বেলজিয়ান্, এদিকে এসো। যতক্ষণ আমাদের বোঝাই শেষ না হয়, ততক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকো। তারপর এই মর্ম্মে তোমাকে সই করতে হবে যে, তুমি সমস্ত জিনিষ হস্তান্তরিত করেছ।

সৈনিকটি তার কাঁধ থেকে রাইফেলটা নামিয়ে হাতের তলায় সেটা ঠিক ক'রে ধরলো। তারপর এ্যালবার্টের দিকে একবার ভ্রূকুটি করে, তার পিছনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আর দুটি সৈনিক মিউজিয়াম হতে জিনিষগুলি বাইরে নিয়ে আসতে লাগল। এ্যালবার্ট নিরুৎসুকভাবে ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

একজন পথিক রাস্তার মোড় ঘুরে ভ্যান্ একেনের বাড়ীর দিকে আসছিল। কিন্তু যখন সে এ্যালবার্টকে ও তার পিছনে দাঁড়ানো রাইফেল হাতে জার্ম্মান সৈনিককে দেখলো, সেই মুহূর্ত্তে সে পিছন ফিরে পালিয়ে গেল। রাস্তা থেকে এ্যালবার্টকে যেন না দেখা যায়, সেই উদ্দেশ্যে মাগুনা তাকে ট্রাকের কাছ থেকে সরে এসে বাড়ীর ভিতরে দাঁড়াবার আদেশ দিল। যে সৈনিকটি এ্যালবার্টকে পাহারা দিচ্ছিল, সেও তার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো এবং পাথরের মেঝের উপর রাইফেলের বাঁট্টা রেখে হলের ভিতর দাঁড়ালো। সার্জেন্ট মেজর বাইরে ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু রাস্তাটা হঠাৎ একেবারে নির্জ্জন হয়ে গেল। একটি পথচারীকেও আর সেই পথ পার হতে দেখা গেল না। এমনকি দূরের পদশব্দ পর্য্যন্ত থেমে গেল, কথাবার্ত্তা চাপা অস্পষ্ট হয়ে গেল। নদীর ধারে কতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল, চারদিকের এই নিঃশব্দতায় ভয় পেয়ে তারা বাড়ী পালিয়ে গেল।

একটি সৈনিক সেণ্ট জাষ্টিনের সেই কল্পিত মূর্ত্তির একটিকে মাথায় করে বাইরে নিয়ে আসছিল। ট্রাকের ধারে দাঁড়িয়ে সে মাথা নীচু করে মূর্ত্তিটাকে ট্রাকের ভিতরে ফেলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সে এত বেঁটে যে মূর্ত্তিটা অতদূর পৌঁছলো না—ধারে আটকে গেল। সৈনিকটি তখন চাকার উপর উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তবুও সে নাগাল পেল না এবং পা ফস্‌কে প্রায় আছাড় খাবার মত অবস্থা হোলো। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মনে মনে শপথ-বাণী উচ্চারণ করে সে মূর্ত্তিটাকে তলা থেকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল। মূর্ত্তিটা প্রচণ্ড শব্দে ট্রাকের ভিতর গড়িয়ে পড়ল। এ্যালবার্ট কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং ট্রাকের দিকে দৌড়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার রক্ষী পিছন দিক হতে তার টুঁটি টিপে ধরলো এবং তাকে তার জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে তার পায়ে জোরে একটা আঘাত করলো। এ্যালবার্ট যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। মাগুনা তার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করলো—অন্য কেউ হলে গুলি করে তোমাকে মেরে ফেলতো।

ইতিমধ্যে অপর একটি সৈনিক একটি ছবি নিয়ে আসছিল—সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো ভ্যান্ আইক্, জুনিয়র, অঙ্কিত একখানি ছবি। সৈনিকটির গালদুটো গোলাপী, ফুলো ফুলো হাত পা,অত্যন্ত অলস ভাবভঙ্গী এবং কেমন অদ্ভুত চালচলন। ঠোঁটের উপর জোর করে একটু হাসি ফুটিয়ে সে বেঁটে সৈনিকটিকে বললো—বার্ণার্ড, ভারি সুন্দর ফ্রেমটা। আগুনে ব্যবহার করলে এক বালতি কয়লার কাজ করবে। তার ওপর বার্ণিশ লাগানো শুক্‌নো ফ্রেম—ভারি সুন্দর আগুন হবে।

বেঁটে সৈনিকটি বললো—ফিলিপ, ওটা আমার হাতে দাও।

গোলাপী-গালের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে বেঁটে সৈনিকটি সেটা ছুঁড়ে ট্রাকের মধ্যে ফেলে দিল আর বললো—যাও, ঐ পুরানো আবর্জ্জনার স্তূপে যাও।

গোলাপী-গাল সৈনিকটি একবার ট্রাকের ভিতরে তাকিয়ে দেখে বললো—এই রে, ছবিটার ক্যান্‌ভাস্ খানিকটা ছিঁড়ে গেছে।

—ক্ষতি কি, ঐ ছেঁড়া ক্যানভাস্ অনেক কাজে আসবে।

দুজনে বোকার মত হেসে উঠলো।

—পাজীগুলো হাসছে। কথাটা বলে মাগুনা এ্যালবার্টের দিকে তাকালো, তারপর নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো। তাকে হাসতে দেখে তার সঙ্গে তাল দিয়ে সৈনিকদুটোও আবার হেসে উঠলো। সার্জেন্ট মেজর হাতের ইঙ্গিতে তাদের থামালো—

—গাধার মত চীৎকার করছো কেন? আর ওহে বেলজিয়ান, এতে কিছু মনে কোরো না। ওরা খুব ভাল ছেলে। ওদের হাতে যদি কিছু নষ্ট হয়ে থাকে, তবে বুঝবে—সেটা একটা দুর্ঘটনা, ওরা ইচ্ছা ক'রে করেনি। তাছাড়া ঐ ক্যানভাসের উপর আঁকা মেয়ের ছবির প্রতি ওদের কোন কৌতূহল নেই, রক্ত-মাংসের মেয়ে হলে একবার দেখতে, তাদের সম্পর্কে ওরা এক একজন বিশেষজ্ঞ।

এ্যালবার্ট অনুভব করলো, কে যেন তার গলাটা টিপে ধরেছে। একটা প্রবল কান্না তার গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলো। সে তার দৃষ্টিকে সরিয়ে নিল—পথের ধারে একটা বাদাম গাছের দিকে প্রাণপণে সে তাকিয়ে রইলো। গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল ঘন পাতার জালে আটকে গিয়ে বাতাসে দুলছিল, সেদিকে তাকিয়ে এ্যালবার্ট অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করলো। হাতের আঙ্গুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছিল, চেষ্টা করে তাকে সে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলো। এ্যালবার্টের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে সার্জেন্ট মেজর মাগুনা বললো—এইসব বদমাস্কে মেরে ফেলাই ভাল। এদের সঙ্গে যত ভদ্র ব্যবহার করো না কেন, সাপের মত এরা চুপ করে থাকবে।

বেঁটে সৈনিকটি এই সময়ে অনেকগুলো জিনিষ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এক হাতে সে প্রস্তর-স্থপতিদের সেই পতাকার দণ্ডটি চেপে ধরেছিল—আর পতাকাটি ভাঁজ খুলে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছিল।

—করছো কি?—এ্যালবার্ট আর থাকতে না পেরে বলে উঠলো—দেখছো না, ওটা একটা পতাকা, ওটা যে মাটিতে লুটোচ্ছে।

—পতাকা? কোথায় পতাকা? কিসের পতাকা?—বেঁটে সৈনিকটি কিছু না জানবার ভান করে বোকা সাজলো। কোথায়? সে এদিক ওদিক ঘুরে তাকিয়ে দেখল—তারপর পতাকাটির গায়ে সোনালী অক্ষরে সেলাই করা

"এ্যানো ডোমিনি ১৩০২" লেখাটির উপর পা দিয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি একসাথে কেন্দ্রীভূত করে এ্যালবার্ট নিজেকে সংযত করলো।

ঠিক সেই সময় কে যেন হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো। সেই বিষণ্ণ ও অপ্রত্যাশিত চীৎকার একটা আর্ত্তনাদের মত মনে হোলো। আবার ঠিক এই সময় জোরে বাতাস উঠলো এবং সেই সঙ্গে কয়েকটা বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা দেওয়ালের গায়ে ফেটে পড়লো। চীৎকারের শব্দ ঠিক কোনদিক থেকে এলো, বোঝা গেল না।

এ্যালবার্টের কাছে সেটা লুসার গলার স্বর বলে মনে হোলো। বোধ হয় সে ও ম্যারিক লুকিয়ে লুকিয়ে সব কিছু দেখছে।

হঠাৎ ভারী পর্দ্দার মত ঠাণ্ডা বৃষ্টি নেমে এলো। উত্তর সাগরের বাতাসে ভেসে আসা ভিজে কুয়াশার মত সে বৃষ্টি চারদিক ঢেকে ফেললো।

—জাহান্নমে যাক্,—মাগুনা বিড় বিড় করে বলে উঠলো, কতগুলি আবর্জ্জনার জন্য আমি বৃষ্টিতে ভিজতে পারবনা। এখন থাক, বৃষ্টির পর শেষ করবো।

এ্যালবার্টের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ তাকে একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে সার্জ্জেণ্ট মেজর ড্রাইভারের পাশে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী-গাল আর বেঁটে লাফিয়ে ট্রাকের উপর উঠলো।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরও জোরে চেপে এলো।

—চল, যাওয়া যাক্।—মাগুনা আদেশ দিল।

এ্যালবার্ট হঠাৎ ছুটে মাগুনার কাছে এলো এবং ট্রাকের উপর বোঝাই করা জিনিষগুলি একটা কান্‌ভ্যাস্ দিয়ে ঢেকে দেবার অনুমতি প্রার্থনা করলো। একটু ইতস্ততঃ করে মাগুনা অবশেষে রাজী হোলো—আচ্ছা বেশ, ক্যান্‌ভাস্‌টা নিয়ে এসো। দেখা যাক।

এ্যালবার্ট ক্যান্‌ভাস্‌টা নিয়ে এলো। মাগুনার সেটা খুব পছন্দ হোলো। সেটা হাতে নিয়ে সে সামনের সিটে নিজের পাশে রাখলো।

—এই ক্যান্‌ভাস্‌টা আমি নিজেই নিলাম। এটা বেশ ভাল জিনিষ। তোমার ঐসব আবর্জ্জনা যদি একটু বৃষ্টিতে ভেজে তো কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের

আগুনে আবার সব শুকিয়ে যাবে। এইবার তোমার এইসব সম্পত্তিকে শেষ বিদায় জানিয়ে, একটি কথা না বলে বাড়ী ফিরে যাও। বৃষ্টির পর ফিরে এসে আমরা বাকি জিনিষগুলি নিয়ে যাব।

ইঞ্জিনের শব্দ তুলে ট্রাক চলে গেল, আর এ্যালবার্ট বাড়ী ফিরে এলো।

হলঘরের চৌকাঠের সামনে ফেলে যাওয়া এক বাণ্ডিল কাগজ এ্যালবার্ট কুড়িয়ে পেল। কাগজগুলোতে সেই আগুনে পোড়া মেয়ের কাহিনী লেখা ছিল।

এ্যালবার্টের মনে পড়লো, সে কিভাবে নগরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করেছিল। কত সন্ধ্যা সে কাটিয়েছে এই সব কাগজের ভিতর লেখা তার পূর্ব্ব-পুরুষদের নানা মহত্বের কাহিনী পাঠ করে। বেলজিয়ানদের গৌরবময় অতীতের কথা চিন্তা করে সে নিজে গৌরবান্বিত বোধ করেছে। ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের বিরাটত্ব সে অনুভব করেছে। কাগজের ছোট বাণ্ডিলটাকে সে বুকের উপর চেপে ধরলো। এই বাণ্ডিলটা সে লুকিয়ে রাখবে, জার্ম্মানরা এর নাগাল পাবে না।

জোর করে সে নিজেকে শান্ত করলো। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সে এইবার সবকিছু বিচার করবে—গোড়া থেকে সব কিছু ভেবে দেখবে। তার কর্ত্তব্য কি? সে কি এই মুহূর্ত্তে জার্ম্মানদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে? কিংবা কোন কথা না বলে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করবে ও সেই অনুসারে কাজ করবে?

মস্কোর কাছে যে যুদ্ধ চলেছে, তার কথা সে মনে মনে ভাবলো। আবার এই কথা ভেবে তার বড় অদ্ভুত মনে হোলো যে, সে—বেলজিয়ামের অধিবাসী এ্যালবার্ট ভ্যান্ একেন—যে নিজের দেশের সীমানা পার হয়ে কোনদিন ভ্রমণে বার হয়নি—যার পূর্ব্ব-পুরুষরা ছিলেন মধ্য-যুগের একদল কারিগর এবং মস্কোর নাম পর্য্যন্ত বোধহয় শোনেনি—আজ তার ব্যক্তিগত ভাগ্য সেই দূর-দেশের ঘটনার গতির উপর কিছু পরিমাণে নির্ভর করছে।

ছেলেবেলার কথা তার মনে পড়লো। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তার নিজের দেশে এমন পরিবার প্রায় ছিল না বললেই চলে, যাদের কোন না কোন প্রকারে রাশিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। অনেকে দক্ষিণ রাশিয়ায় কাজে নিযুক্ত ছিল। ডোনেজ্ বেসিনের খনিতে, ইউরালে, রাশিয়ার সহরের মোটর ও

ইলেট্রিকের কারখানায় তারা কাজ করতো। অনেকের দূর এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনরা রাশিয়ায় কাজ করতে আসতো। এমন অনেকে ছিল—যারা রাশিয়ায় বেলজিয়ান জয়েন্ট-স্টক্ কোম্পানীগুলিতে সুদে টাকা খাটাতো। ব্যাঙ্ক ও স্টক-ব্রোকার অফিসগুলোর জানালায় যে সব বিজ্ঞাপন মারা হোতো, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রাশিয়ার কতগুলি ভৌগলিক নামের সাথে সহরের অন্যান্য অনেকের মত সে-ও পরিচিত ছিল। যেমন স্তারায়া কন্‌স্তান্টিনোভ্‌কা, ক্রিভয় রগ্‌ একতেরিনোস্লাভ্‌—ইত্যাদি। বড় হয়ে রাশিয়ার সম্পর্কে সে যা কিছু জানতে পারলো, সবই নানা বিরুদ্ধ মত ও তর্কে অস্পষ্ট হয়ে রইলো। বোধহয় এখন সে সেই দেশের উপর অনেক কিছু আশা করতে পারে। কিন্তু সেখানে মস্কোর সামনে যা কিছু ঘটছে, তার থেকে এখনই কোন বাস্তব সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গতভাবে করা যায় কি? তার মনে হোলো—না, এখনও নয়।

এ্যালবার্ট টেবিলের সামনে গেল এবং একটুকরো কাগজ টেনে নিয়ে মেজরের কাছে একটা চিঠি লিখলো। চিঠিতে সে অনুরোধ জানালো,—আর একবার ভেবে দেখবার জন্য তাকে আরও কিছু সময় দেওয়া হোক, এবং ইতিমধ্যে তার মিউজিয়ামের স্থানান্তর কার্য্য বন্ধ করা হোক।

চিঠিটা লিখবার পর তার ভয় হোলো। এ সে কি করলো? এ চিঠি যদি সে পাঠায়, তাহলে কি তার মতামত ও ইচ্ছার অপেক্ষা না রেখেই ঘটনার গতি অগ্রসর হবে না? সে ভুলের কি প্রতিকার আছে?

নিজেকে শান্ত করবার জন্য সে ড্রয়ার খুলে আবার সেই ওয়ালূন্‌ মিনিয়েচারটিকে বার করলো। সকালে লুসা যখন জার্ম্মানদের আগমন-বার্ত্তা তাকে জানিয়েছিল, তখন সে এই মিনিয়েচারটিকেই পরীক্ষা করছিল। ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাশটা তুলতে গিয়ে দেখলো, তার হাত কাঁপছে। সে মিনিয়েচারটিকে একপাশে রেখে দিল। সন্দেহে, অমঙ্গল-আশঙ্কায়, নিজের প্রতি অসন্তোষে তার মন ভরে গেল। নিজেকে তার অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসুখী বলে মনে হোলো। নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা সে একেবারে ভুলে গেল এবং একটা অন্ধ অতলস্পর্শী হতাশা তাকে গ্রাস করলো।

এ্যালবার্ট তার বোধশক্তি হারিয়ে ফেললো। তার জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল যেন এবং এই অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার মনে হোলো সে অত্যন্ত অসুখী, কোন কিছুতে সে সান্ত্বনা পাবে না।

একটা চীৎকার ও কতগুলি উত্তেজিত গলার শব্দে এ্যালবার্টের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার বোধশক্তি ভাল করে ফিরে আসবার আগেই সে ছুটে টেবিলের কাছে গেল। সে একটা লজ্জাকর পথ বেছে নিয়েছে —এই ধরণের একটা সচেতন বোধ সতর্ক প্রহরীর মত তার মনের ভিতর জেগে ছিল। এমন কি, ঘুমের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্যও সে একথা ভুলতে পারেনি—সেই বোধের বশবর্ত্তী হয়ে সে মেজরের কাছে লেখা তার চিঠিটা তুলে নিল এবং টুক্‌রো, টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ওয়েষ্টপেপার বাস্কেটে ফেলে দিল। তারপর তার মনে হোলো, টুক্‌রোগুলো এখনও যথেষ্ট বড় রয়েছে, ওগুলো জোড়া লাগিয়ে এখনও পড়া চলে। সে নীচু হয়ে বসে টুক্‌রোগুলো একটি একটি করে তুলে কুচি কুচি করে ফেললো। কিন্তু তাতেও সে সন্তুষ্ট হোলো না। কাগজের কুচিগুলো সে আবার সংগ্রহ করলো এবং সেগুলো আগুনের ভিতর নিক্ষেপ করলো।

হঠাৎ তার মনে ভয় উপস্থিত হোলো। তার বিবেক কি এতই অপরাধী? কিন্তু সে তো এখনও কিছুই করেনি। তবু এ সব কথা কল্পনা করাও পাপ।

হলঘরে আবার চীৎকার হোলো। এবার ম্যারিকের গলা। এ্যালবার্ট তার কাছে ছুটে গেল।

কিন্তু একি? সে কি দেখছে? এও কি সম্ভব? পৃথিবীতে কি এখনও সুখ ও আনন্দ আছে? ম্যাথু! সে গোপন পথের সাহায্যে বাড়ীর ভিতর ঢুকেছে।

এ্যালবার্ট তাকিয়ে তাকিয়ে ম্যাথুকে দেখলো। রোগা, লম্বা, একটু অপরিষ্কার, বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুটিতে হাসির আভা। লম্বা শক্ত হাতে সে ম্যারিককে উঁচুতে তুলে ধরেছে, পাশে দাঁড়িয়ে লুসা চোখের জল মুছছে। এ্যালবার্টের মনে হোলো, তার সমস্ত দুঃখ ও কষ্ট একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

কিন্তু এই চিন্তাও এ্যালবার্টের মনে ক্ষণস্থায়ী হোলো। ম্যাথু তাকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করলো, তবুও এ্যালবার্টের মনে হোলো পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি

নেই—যা তাকে এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাকে আজ যে কোন একটি পথ বেছে নিতে হবে। যদিও তার বাড়ীতে অপ্রত্যাশিত আনন্দ উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ আরও তীব্রতর হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এই পথের সমস্যা দুর্লঙ্ঘ্য ও অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে।

*　　　　*　　　　*

সমস্ত দরজা বন্ধ ক'রে—দুই ভাই, ম্যারিক ও লুসা একটা টেবিল ঘিরে বসলো।

ম্যাথু বললো—এখন সব চেয়ে ভাল হয়, যদি লুসা আমাদের জন্য কিছু পানীয় আনে।

ম্যারিকের একটা হাত নিজের হাতের উপর রেখে ম্যাথু বসেছিল,—ম্যারিকের প্রতি সে কোমল ও প্রিয় এবং তার ভাই ও লুসার প্রতি ভদ্র ও মনোযোগী।

লুসা ঠাট্টা করে বললো—ঠিক, একেবারেই ম্যাথুর মত মনে হচ্ছে না। ম্যাথু এত কথা বলতো না, সব সময় চোখ ঘোঁচ করে থাকতো এবং যখন কথা বলতো তখন হয় অপমান করতো নয়তো বিদ্রূপ করতো। তবুও তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে না—তুমি খুব প্রফুল্লতা বোধ করছ। তোমার মনে তিক্ততা রয়েছে। আগেকার সেই গর্ব্বিতভাব আর নেই। তুমি কেমন নুয়ে পড়েছ—যেন তোমার কাঁধের উপর ভারী বোঝা চাপানো হয়েছে। আর তোমার চোখ দু'টি—আমার মোটেও ভাল লাগছে না—তোমার চোখের ভাষায় বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে।

লুসার কথা শুনে এ্যালবার্ট হেসে উঠলো।

—না, পিসীমা। এখনই বরং আমরা আসল ম্যাথুকে ফিরে পেয়েছি,—ছেলেবেলায় সে ঠিক যেমন ছিল। কিন্তু ম্যাথু, তুমি যখন বড় হয়ে উঠলে—রাগ কোরো না—তুমি বড় কঠিন ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলে। কিন্তু এখন তোমার চোখে একটা শান্ত ও স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা ফুটে উঠেছে—ঠিক আমাদের মা'র মতো। তোমার হাসি মধুরতর হয়েছে। শুধু আমার মনে হচ্ছে—তুমি যখন হাসছো, তখন একটা কিছুকে জোর ক'রে চেপে রাখতে হচ্ছে। মুক্ত দৃষ্টিতে তুমি চারদিকে

তাকাতে পারছো না। একটা অদৃশ্য বাঁধা তোমার চোখের দৃষ্টিকে অস্পষ্ট করে তুলছে। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত এবং তোমার মনে কোন দুঃখ আছে।

ম্যারিক খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারও মনে কেমন একটা ভয় হচ্ছিল। চারদিকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল—যেন এই মুহূর্ত্তে কেউ ঘরে ঢুকে কোন অশুভ বার্ত্তা ঘোষণা করবে। তার একটি স্বপ্ন সফল হয়েছে এইজন্য সে আজ সুখী। ম্যাথু ফিরে এসেছে—কিন্তু রেণী, রেণী এখনও ফিরে আসেনি।

—রেণী? সে কোথায়?—স্বামীর সাথে প্রথম কথা সে এই প্রশ্ন দিয়ে সুরু করলো।—সে কি ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে পারেনি? আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না।

—ম্যারিক, তোমার কাছে আমি কিছু লুকোব না। ইংল্যাণ্ডে সে যেতে পারেনি।

—তার মানে, সে বেলজিয়ামে আছে?

—বেলজিয়ামেই আছে।

—তোমার সাথে কি তার দেখা হয়েছে?

—আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে তার দেখা হয়েছে, ম্যারিক।

—কিন্তু তোমার সাথে কেন দেখা হোলো না?

—আমি যখন গেলাম, সে তখন সেখানে ছিল না।

—কোথায় ছিল না?

—সেখানে, যেখানে আমি গেলাম।

—তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বলছো না। সে কি আমার কাছে আসবে?

—সে আসবে না ম্যারিক, আমরা তার কাছে যাব।

এ্যালবার্ট ম্যাথুকে তার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকলাপের কথা জিজ্ঞাসা করলো।

কিন্তু ম্যাথু প্রথমে নিজের কথা বলতে চাইলো না। সে অত্যন্ত সাবধানী, নিজের সম্পর্কে কিছু বলবার আগে সঙ্গীদের সে নানা প্রশ্ন করতো—যদিও তারা তার কাছে বিশেষভাবে পরিচিত।

এ্যালবার্ট সাধারণতঃ মন খুলে কথা বলতো। কিন্তু এখন সোজাসুজি প্রশ্ন এড়িয়ে গেল। ম্যাথুর প্রশ্নের ধরণ দেখে এ্যালবার্ট বুঝতে পারলো, সে এই সহরের অতি সামান্য ঘটনা হতে স্বরু করে সব কিছু জানে। ভ্যান্ একেনের বাড়ীতে জার্ম্মানদের আবির্ভাবের কথাও সে বোধ হয় জানে। এমন কি, তাদের আগমনের উদ্দেশ্য এবং এ্যালবার্টের সাথে তাদের কথাবার্ত্তাও বোধ হয় তার অগোচর নয়। ম্যাথু সব কথা জানতে পারতো—অন্য লোকের মনে যে সম্পর্কে কোন ধারণা পর্য্যন্ত থাকতো না।

দুই ভাইয়ের প্রত্যেকেই অপেক্ষা করতে লাগল—অপরজন প্রথমে খোলাখুলি সব কথা বলবে। তারা দুজনে বিভিন্ন পথের যাত্রী এবং গত কয়েক মাস বিভিন্ন অবস্থার ভিতর জীবন কাটিয়েছে। দুজনেরই মনে এই ভয় হোলো—তারা বোধ হয় পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

এ্যালবার্টের কাছে ম্যাথুর মতামত দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মের মত ছিল। তার এই পীড়াদায়ক মতি-চাঞ্চল্যে যে সাহায্য সে খুঁজে বেড়াচ্ছে, ম্যাথুর কাছে সেটা সে হয়ত পেতে পারে। আর ম্যাথুকে দেখে মনে হয়, আসন্ন কোন প্রয়োজনে এ্যালবার্টকে তার দরকার। তারা দুজনেই মনে মনে একটা নির্জ্জন স্বযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

ম্যাথু বললো যে, তার ভয় হচ্ছে—জার্ম্মানরা বোধ হয় তাকে অনুসরণ করে এসেছে। স্বতরাং এ বাড়ীর ভিতর বেশীক্ষণ থাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। মাটির তলার গুপ্ত পথে সে যেমন এসেছে, আবার তেমনি চলে যাবে।

ম্যারিক ঘোষণা করলো—আমাকে তোমার সঙ্গে নিতে হবে। আমি আর এখানে থাকব না। আমার ভয় হয়েছিল, ম্যাথু।

এ্যালবার্ট ম্যারিকের কথা সমর্থন করলো। বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়াকে লুসা সব চেয়ে ভয় করে। তার মনে রীতিমত ভয় উপস্থিত হোলো। কি করবে—কিছুই ঠিক করতে না পেরে সে চুপ করে রইলো। ওরা তার সম্পর্কে কি ঠিক করে, সেটা জানবার জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল।

ম্যাথু গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল।

—আমি এখানে এতদিন ছিলাম, তার কারণ আমি রেণী এবং তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এখন আমার উপর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। শুনেছ তো? ম্যাথু, তুমি কি ভাবছ বলোতো?

ম্যাথু নিজের চিন্তায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

—ম্যাথু, তোমার হোলো কি?

—না ম্যারিক, ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। আমি তোমাকে নিতেই এসেছিলাম এবং নিয়েও যাব—কিন্তু তুমি এখনকার মত এই বাড়ীতেই থাক। তুমি যদি আজ এই বাড়ী থেকে অদৃশ্য হও, তবে আমি যে কাজের জন্য সহরে এসেছি, তার পক্ষে বাধার সৃষ্টি হবে।

লুসার মনে হোলো, সে বুঝতে পেরেছে—ম্যাথু কেন এই মুহূর্ত্তে ম্যারিককে তার সঙ্গে নিতে অস্বীকার করছে।

—ম্যারিক, তুমি এখন এখানেই থাক। ম্যাথুকে কি তুমি এতদিনেও বুঝতে পারলে না? সে কোনদিন কোন কথা স্পষ্ট করে বলে না। কিন্তু এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রেণী আসবে। সে আসবে এবং তোমার কাছেই আসবে। ম্যাথু তোমার জন্য একটা মধুর বিস্ময়ের সৃষ্টি করছে।

—ম্যাথু, একথা কি সত্যি?

—না ম্যারিক, লুসা ভুল করেছে। রেণী আসবে না।

—তোমার বুড়ো পিসীমা তোমাকে বলছে যে, রেণী আসবে। রেণী! সে তার মাকে কত ভালবাসে। এমন সোনার ছেলে পৃথিবীতে আর একটিও নেই। তার বাবা যখন এখানে এসেছে, সে কি অন্য কোথাও পড়ে থাকতে পারে? কখনো না। এক মিনিটের জন্য হলেও সে একবার আসবে—ডানায় ভর করে উড়ে আসবে। আমাদের রেণী, কি চমৎকার ছেলে, আর কারও ছেলে এমন হয় না। কত বিনয়ী, কত স্নেহশীল, কত পবিত্র, কত উদার, কত মহৎ। কোন কাজে সে ভুল করে না, একটি মিথ্যা কথা বলে না। আর তুমি বলছো, সেই রেণী আসবে না? সে নিশ্চয়ই আসবে।

ম্যাথু হঠাৎ প্রচণ্ড ক্রোধে চীৎকার করে উঠলো। ছেলেবেলা থেকে যারা ম্যাথুকে দেখছে, তারা তার এই ক্রোধের সাথে পরিচিত।

—লুসা, চুপ কর। আর একটি কথা নয়। কোন সাহসে তুমি এসব কথা বলছ,—ম্যাথু গর্জ্জন করে উঠলো।

লুসা একটি কথা বললো না, তার রীতিমত ভয় হোলো। ম্যারিকের মনেও কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হোলো।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ম্যাথু আত্মসম্বরণ করে নিল এবং ম্যারিককে সান্ত্বনা দিল—আচ্ছা বেশ, আমি তোমাকে এখনই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও। কিন্তু তার আগে একটা দরকারী বিষয়ে আমি এ্যালবার্টের সাথে কথা বলতে চাই।

দুই ভাই মিউজিয়ামের ভিতর গেল। এ্যালবার্ট তাকে মিউজিয়ামের নানা জিনিষ দেখিয়ে—কি ভাবে ও কখন সে সেগুলি সংগ্রহ করেছে সেই কাহিনী বলতে সুরু করলো। কিন্তু ম্যাথু সঙ্গে সঙ্গে তার কথায় বাধা দিলো—আমরা এখানে কথা বলবো না।

ম্যাথু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। গভীর চিন্তায় তার মাথাটা নুয়ে পড়েছিল। তার সমস্ত শরীর থেকে একটা কিসের বেদনা ফুটে বেরোচ্ছিল। সে নিঃশব্দে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

এ্যালবার্ট বিচলিত হোলো এবং ভয় পেল। সে তার দাদার কাছে এগিয়ে এসে বললো—দাদা, তুমি আমাকে বলো, কেন তুমি এত কাতর ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছ? আমাদের রেণীর কিছু হয়নি তো?

ম্যাথু দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা কাঠের বেঞ্চের উপর বসে পড়লো। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সে আবার উঠে দাঁড়ালো।

—এ্যালবার্ট, যে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে এবং যে কর্ত্তব্য আমাদের পালন করতে হবে—সেই বিষয়ের প্রতি আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলবার চেষ্টা কোরো না।

ম্যাথু তার মাথা তুললো এবং হাত দুটো একটা বিশেষ ভঙ্গিতে নাড়লো—

মনে হোলো যেন তার মনের কোন চিন্তাকে জোর করে সে তাড়িয়ে দিল। নিজের হাতের ভঙ্গি দেখে তার নিজের মুখেই একটা তিক্ত হাসি ফুটে উঠলো।

—একজন ভ্রমণকারী আমাকে বলেছিল, ইউরোপের মধ্যে দুটি লোকের বাহু তার চোখে দীর্ঘতম মনে হয়েছে—একজন ডাচ সমাজতন্ত্রী ট্রয়েল্‌স্ট্রা, আর অপরজন আমি। একবার তাকিয়ে দেখ, আমার হাত কত লম্বা।—এই কথা বলে সে জানালার দিকে তার বাহুদুটি প্রসারিত করে দিল। কিছুক্ষণ পর সে আবার বললো—আচ্ছা তুমি কি কখনও মাটির তলার ঘরে যাতায়াত করো? সব কিছু ঠিক অবস্থায় আছে তো? যখন আমি ওপথ দিয়ে এলাম, তখন আমি কোনদিকে তাকাইনি। তোমাদের সকলকে দেখবার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলাম।

—তুমি যাবার সময় যেমন দেখে গেছিলে, ঠিক তেমনি ভালো অবস্থায় আছে। কিন্তু একথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছো? তোমার কি মনে হয় ও ঘরটা কাজে লাগবে?

—এমনি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করছি। বারুদ ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। যদি অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে, তবে ম্যারিককে যে কোন উপায়ে বাঁচাবার চেষ্টা কোরো।

—ম্যাথু, পরিষ্কার করে খুলে বলো।

—এ্যালবার্ট, এই সহরে গুরুতর ঘটনা ঘটতে পারে।

—তোমার হেঁয়ালী ছাড়ো। তুমি যা জানো, সব আমার কাছে বলো। তুমি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছো।

ম্যাথু তার ছোট ভাইকে কতটুকু বলতে পারে? ব্রাশেল্‌স্‌-এ তার বন্ধুদের অনুরোধে সে তার দেশে ফিরে এসেছে। সেখানে খবর গেছে ফ্রান্সের উত্তর উপকূল এবং পশ্চিম ফ্ল্যাণ্ডার্সের নানা সহর থেকে সেনাবাহিনী পূর্ব্ব-রণক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবে। তারা এই খবরও পেয়েছে যে, ম্যাথুর দেশ—এই সহরের রেল-জংসন এইসব সেনাবাহী ট্রেণের মিলনস্থান হবে। যে কোন উপায়ে এই সব ট্রেণের চলাচল একেবারে বন্ধ কিংবা যথাসম্ভব বিলম্বিত করতে হবে—এই কাজের ভার ম্যাথুর উপর অর্পণ করা হ'য়েছে।

ম্যাথু এ্যালবার্টকে একথাও বলতে পারতো, এই সহরে যাদের সাহায্য সে প্রত্যাশা করে—তাদের সবার সাথে সে সাক্ষাৎ করেছে। কিন্তু সকলেই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। একথাও সে বলতে পারতো, তাদের সকলের মুখেই এক কথা এবং এক প্রশ্ন—তার ছোট ভাই এ্যালবার্ট ভ্যান্ একেন্ এত ধৈর্য্য ও এত অধ্যবসায়ের সাথে জাতীয় গৌরবের যে সমস্ত পবিত্র স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করেছে এবং যেগুলো রক্ষা করবার দায়িত্ব সে নির্ভীকভাবে গ্রহণ করেছে—তার পক্ষে তাদের জার্ম্মান-বিরোধী কার্য্যকলাপ কি ক্ষতিকর হবে না?

গত কয়েকঘণ্টা সহরে কাটিয়ে একটা বিষয়ে ম্যাথু নিশ্চিত হয়েছে যে, অধিকাংশ সহরবাসীর কাছে এ্যালবার্ট হচ্ছে আদর্শস্থানীয়। বিজয়ী শত্রুর কাছে তারা নতি স্বীকার করবে—না তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, এ প্রশ্নের মীমাংসাও তারা এ্যালবার্টের দিকে তাকিয়ে করবে। এই সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তিদের অনেকেই খোলাখুলি ম্যাথুকে বলেছে—এ্যালবার্ট যা করে আমরা তাই করবো। সে ধীর ও স্থির ভাবে যা কিছু রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে, আমরা সেগুলো বিপদগ্রস্থ করতে চাই না।

ম্যাথু বুঝতে পারল, সে যদি এ্যালবার্টকে দলে পায়—তবে জনসাধারণের সমর্থন সহজেই সে পাবে। এ্যালবার্টের প্রতি জনসাধারণের আস্থাকে সে সহজেই তুচ্ছ করতে পারতো—যদি রণক্ষেত্রে বিজয়ী শত্রুর ভাগ্য সুস্পষ্টরূপে বিরূপ হয়ে উঠতো। সেই দিনের অপেক্ষা করে সে কি বসে থাকবে? তার উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করতে হলে ক্ষিপ্রতম প্রচেষ্টা দরকার নয় কি?

ম্যাথু প্রথমে ভেবে পেল না, কি ভাবে সে এ্যালবার্টের সাথে কথা সুরু করবে। খোলাখুলি সব কথা বলাই কি ভাল নয়? মনে মনে সে কতগুলো প্রশ্ন ঠিক করলো—আশা করি আত্মসমর্পণ করাকে তুমি ঘৃণা করো? জার্ম্মানদের সাথে তুমি কোন সহযোগিতা করছো না নিশ্চয়ই? কিন্তু সে এ্যালবার্টকে কোন প্রশ্ন করবার সুযোগ পেল না। এ্যালবার্ট সোজাসুজি কথা বলতে অস্বীকার করলো। ম্যাথু তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছে না দেখে সে রীতিমত আঘাত পেল, এবং তার কাছে ম্যাথু কি চায় স্পষ্টভাবে জানতে চাইল। ম্যাথুর সমস্ত দ্বিধা দূর

হয়ে গেল। ভ্যান্ একেন বংশে এ্যালবার্টের জন্ম মিথ্যা হয় নি। ভ্যান একেনদের দেশপ্রেম সন্দেহের মাপকাঠিতে যাচাই করবার প্রশ্ন কোনদিন ওঠেনি। যদি আজকের এই পরাজয়ের আবহাওয়ায় এ্যালবার্ট তার স্থিরতা হারিয়ে থাকে—তবে তার প্রতি তার ভাইয়ের বিশ্বাস তাকে আবার নতুন শক্তি দান করবে।

ম্যাথু তার ভাইকে সব কথা খুলে বললো। শুধু একটি কথা যা সে বললো না তা হচ্ছে—সে যে সব বিশ্বাসী লোককে আহ্বান জানিয়েছে, তারা সে রাত্রে কোন স্থানে মিলিত হয়ে তাদের কার্য্যকলাপ স্বরু করবে।

—এ্যালবার্ট, এমন মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছে, যখন তুমি সামান্য একটি মুখের কথায় একটা মহৎকার্য্য সম্পন্ন করতে পার। জীবনে তুমি একটিও ভুল করোনি। দেশবাসীর ভিতর তোমার এত প্রভাব যে, তোমার মুখের একটি কথায় চাকা ঘুরে যেতে পারে। তোমার সারা জীবনের সত্যনিষ্ঠ সংগ্রামকে এই চূড়ান্ত ও পরম মুহূর্ত্তের ভিতর জয়যুক্ত করে তোলো।

এ্যালবার্ট জিজ্ঞাসা করলো—ম্যাথু, তুমি আমার কাছে কি চাও?

—আমি চাই, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানাও। হয়তো আমাদের উপর, আমাদের প্রিয়জনের উপর, আমাদের দেশের অতীত গৌরবময় সম্পত্তির উপর বর্ব্বরগুলো অতি ভীষণ প্রতিহিংসা নেবে; কিন্তু সেজন্য আমরা ভয় পাব না। তোমার কাছে আমি এই চাই। উত্তর দাও এ্যালবার্ট।

* * *

সেই ছোট শান্ত ফ্লেমিশ সহরের রুটিন-বাঁধা বৈচিত্র্যহীন জীবনে ম্যাথু সর্ব্বপ্রথম একটা বেসুরো তারের মত বেজে উঠেছিল। উদ্দাম প্রাণপ্রাচুর্য্যে সে চঞ্চল হয়ে উঠতো এবং আগুনের মত শিখা বিস্তার করে জ্বলে জ্বলে উঠতো।

কিন্তু এক জায়গায় দু'ভাইয়ের মিল ছিল। সহরের বুর্জ্জোয়া ও ধনী সম্প্রদায়ের প্রচলিত জীবনযাত্রার প্রতি তারা কোন শ্রদ্ধা প্রকাশ করেনি। চিন্তা ও মতামতের ক্ষেত্রে এ্যালবার্ট প্রচলিত রীতিনীতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতো। প্রচলিত

কুসংস্কারগুলি তার মনকে স্পর্শ করতে পারতো না। কিন্তু তবুও প্রতিদিনকার জীবনে তার কোন চাঞ্চল্য ছিলনা, অন্যান্য সকলের মত একটা বিধিনিষেধের গণ্ডী মেনে চলতো—বোধ হয় প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি ঘটা করে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করাকেও সে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতো।

মেটারলিঙ্কের দর্শন এ্যালবার্টের খুব প্রিয় ছিল। তার দেশের এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিটিকে ভাল করে জানবার জন্য সে একবার ঘেণ্টে বেড়াতে গেছিল। একটি পুরো দিন সে সেই কবি, ভাবুক ও উদ্যান-বিদের আবাস-ভূমিতে কাটালো এবং সেই স্থানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হোলো। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো ছড়ানো লাল টালি দিয়ে মোড়া উচু দেওয়াল চারপাশে আড়াল খাড়া করে বর্ব্বর পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে স্থানটিকে মুক্ত রেখেছে। মেটারলিঙ্কের শিক্ষার সাথে এ্যালবার্ট সম্পূর্ণ একমত ছিল। সে মনে করতো বহিঃপ্রকৃতি অন্তরের উপর নির্ভরশীল। সে প্রায়ই বলতো—

পাহাড়েই ওঠ বা উপত্যকাতেই নামো, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াও বা নিজের ঘরে বসে থাকো—সবসময়ে সর্ব্বত্র তুমি শুধু তোমাকেই দেখতে পাবে। তোমার ভাগ্যের মাপকাঠি তুমি নিজে।…যে সব ঘটনার কোন গুরুত্ব নেই বা কোন অর্থ নেই, সেগুলিও জ্ঞানী লোকের মনে বিরাট চিন্তা ও গভীর ভাবের সৃষ্টি করে। কিন্তু অর্ব্বাচীনের কাছে বড় বড় ঘটনাগুলিও অর্থহীন বলে মনে হয়। তোমার অন্তরই হচ্ছে সবকিছু। যদি তুমি ভালবাসতে পার, সকলের ভালবাসা তুমি পাবে। যদি তোমার মনে ঘৃণা থাকে, সমস্ত পৃথিবী তোমার ঘৃণায় কেঁপে উঠবে। বিশ্বাসঘাতক যে, বিশ্বাস ভঙ্গ করবার সুযোগের অভাব তার হয় না। যে বীর, বীরোচিত কর্ম্ম তার জন্যই অপেক্ষা করে। জ্ঞানী লোকের কাছে মৃত্যুও যখন আসে, শ্রদ্ধায় প্রণাম জানিয়ে আসে।

আর ম্যাথ্যু সব সময়ে প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতো। সে ছোট শিকারী-কোট, ছোট ট্রাউজার এবং মোজা ব্যবহার করতো। সে দাড়ি রেখেছিল। যদিও বছরে দু'শো দিন বৃষ্টি হয়, তবুও সে কখনও ছাতা ব্যবহার করতো না।

ম্যাথু কোন কর্তৃত্ব স্বীকার করতো না। একবার স্কুলের ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে একজন নবাগত মুষ্টিযোদ্ধাকে সে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে বসলো। কারণ কোন একজন লোককে সে বলতে শুনেছিল যে, এই নবাগত যোদ্ধার সমকক্ষ শুধু "এই সহরে কেন, বোধ হয় সারা বেলজিয়ামে নেই।"

যখন ম্যাথু রিং-এর ভিতর ঢুকলো, সেই নবাগত যশস্বী যোদ্ধা তার রোগা, শ্রীহীন দেহ আর সেই দেহের দুপাশে দোদুল্যমান প্যাকাটির মত দুটো হাতের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো, তারপর বললো—প্রিয় বালক, তোমাকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমি লড়তে চাই না।—ক্রোধে ও অপমানে ম্যাথু সঙ্গে সঙ্গে নবাগতকে আক্রমণ করলো।

তারপর যে মুষ্টিযুদ্ধ স্বরু হোলো, তার প্রথম রাউণ্ডেই ম্যাথুর নাক ভেঙ্গে গেল। সে ভাঙ্গা নাক আর সারলো না, সারা জীবন তার মুখের উপর নাকটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত উদ্যত হয়ে রইলো। মুষ্টিযুদ্ধে ম্যাথু নক্-আউট্ হোলো, কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বীকেও সে রীতিমত ঘায়েল করেছিল। স্কুলের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করলো, অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নবাগত মুষ্টিযোদ্ধা তার শক্তির অপব্যবহার করেছে। ম্যাথু সমস্ত দোষ স্বেচ্ছায় নিজের উপর চাপালো। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হোলো—কেন সে এই বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধাকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করতে গেল, তখন কোন কথা না বলে সে তার বাবাকে ক্লডেলের "যোদ্ধার সমাধি" নামক বইখানা বার করে দেখালো। তার বাবা জিজ্ঞাসা করলো—একি? ম্যাথু বইটা খুলে একটা পাতা বার করলো এবং নিঃশব্দে তার বাবাকে দেখালো। তার বাবা সেই পাতাটা পড়লো। সেখানে লেখা ছিল, ফ্লেমিশ যোদ্ধা কেবলমাত্র একটি মাত্র সর্ত্তে যুদ্ধে বিরতি দিতে পারে—যদি তার মৃত্যু হয়। তার বাবা কোন কথা বললো না, কিন্তু কিছুদিন পরে তাকে সঙ্গে করে ব্রাশেলস্ বেড়াতে গেল। সেখানে ল্যুস্ এভিনিউর কেন্দ্রস্থলে স্কোয়ার ও ক্লডেলের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত মনুমেণ্ট সে দেখলো। যে দৃশ্যটি সেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা এই—একটি উদ্ধত বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বীতার আহ্বান ও বিদ্রূপের উত্তরে একটি যুবক মৃত্যুশয্যাশায়ী বীরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে সকলকে দেখাচ্ছে।

মনুমেণ্টের মাথা ইক্লেলেস্ পণ্ডস্-এর চারধারে উপত্যকার সমস্ত বাড়ীর ছাদ ছাড়িয়ে উঠেছিল। সেদিকে তাকিয়ে ম্যাথু বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সে সেই মনুমেণ্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে—সেই বিখ্যাত বীরের ব্রোঞ্জের তৈরী হাতে চুম্বন করলো। আশে পাশে সমস্ত ছেলে বুড়ো হেসে উঠলো, কিন্তু ম্যাথু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জানু পেতে বসে সেই যোদ্ধার হাতে আবার চুম্বন করলো।

ভ্যান্ একেন্ বংশের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী ম্যাথু ও এলবার্ট দুজনেই ফ্রি থিঙ্কার্স ছিল। শিশু বয়স থেকেই তারা ফ্রি থিঙ্কার্সদের সভা ও শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছে, তাদের অর্কেষ্ট্রায় বাজিয়েছে, আসরে গান গেয়েছে এবং লিবারেলদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে ছোটখাটো বহু সাহায্য করেছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে তাদের পিতা, কাকা এবং অন্যান্য বৃদ্ধরাও রীতিমত সাহায্য করেছে। নির্ব্বাচনের সময় উদারপন্থী ও সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে সহযোগিতার ফলে তারা শ্রমিকদলের নেতাদের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। এই সমস্ত লোকের অনাড়ম্বর ব্যবহার এবং লোক-নীতি ও লোক-ভাষায় এদের জ্ঞান দেখে দুই ভাইয়ের মনে একটা ভাল ধারণার সৃষ্টি হোলো।

তারপর ম্যাথু শ্রমিক মহলে যাতায়াত সুরু করলো। তার কারণ দুটো ছিল। উদারপন্থী নেতাদের সে সহ্য করতে পারতো না এবং নির্ভীক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোকের সাথে পরিচিত হবার একটা ইচ্ছা তার ছিল। কিন্তু শ্রমিক দলের সাথে তার বন্ধুত্ব বেশীদিন রইলো না। তার কারণ সেখানে সে দেখলো, তাদের প্রতিদিনকার জীবনে সেই একই সঙ্কীর্ণতা—যা নিজের আশে পাশে অন্য সর্ব্বত্র সে এতদিন লক্ষ্য করে এসেছে। স্থানীয় শ্রমিক সমবায়ের নেতাকে সে প্রকাশ্যে ভণ্ড বলে গালাগালি দিত—কারণ, যদিও সে নাস্তিকতা ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধতা উৎসাহের সাথে প্রচার করতো, তবুও প্রতি রবিবার সে তার স্ত্রী ও কন্যাকে গীর্জ্জায় পাঠাতো—যেন তার কাঠের ব্যবসায়ে ক্যাথলিক ক্রেতাদের সাহায্য ও সহানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত না হয়।

প্রসঙ্গক্রমে, ম্যাথু যখন দেখত—যে সব পরিবার পুরোহিতদের মানতো না এবং প্রচলিত নিয়মানুসারে একমাত্র পুরোহিত-বিরোধী লোকের সাথেই ব্যবসায় সম্পর্ক রাখতো, ক্যাথলিক গোয়ালার কাছে দুধ কিনতো না, ক্যাথলিক ধোপার কাছে

কাপড় কাচাতো না, ক্যাথলিক নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতো না এবং ক্যাথলিক সরাইখানায় চা খেত না—তারাও নিজেদের দোকানে এবং কারখানায় ক্যাথলিক কর্ম্মচারী পছন্দ করতো, কারণ ক্যাথলিক কর্ম্মচারীরা শান্ত ও বাধ্য,—ম্যাথু তাদের বিদ্রূপ না করে থাকতে পারতো না।

১৯১৩ সালে বেলজিয়ামের শ্রমিক দল একটা সাধারণ ধর্ম্মঘট সুরু করলো। একটি ছোট যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা—যেখানে ম্যাথুর পিতা কাজ করতো, সেখানে সে কাজ করছিল। ম্যাথু সর্ব্বান্তঃকরণে এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। কিন্তু যখন নেতাদের অস্থির মতিত্ব ও দুর্ব্বলতার জন্য সেই ধর্ম্মঘটে ভাঁটা পড়লো, তখন সে সমাজতন্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। স্থানীয় স্বার্থকে সমগ্র দেশের স্বার্থের উপরে স্থান দেবার জন্য তাদের যে ঐকান্তিকতা দেখা যেত ম্যাথুর কাছে সেটা নির্লজ্জ বলে মনে হোতো। নিজের মনের মত কোন পার্টি খুঁজে না পেয়ে, ম্যাথু তার সমস্ত মনোযোগ যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ এবং তাকে নিখুঁত করে তুলবার কাজে নিয়োগ করলো।

ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় ম্যাথুর বয়স ছিল কুড়ি। তার পায়ের একটু খুঁতের জন্য তাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হোলো না। জার্ম্মানরা যখন আক্রমণ করলো, তখন এই সহরের যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানায় সে একজন সুদক্ষ শ্রমিক বলে পরিচিত।

সেই সময়ে ম্যাথুর দক্ষতা তার কর্ম্মক্ষেত্রে নতুন নতুন সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু জার্ম্মানরা যখন সেই কারখানা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেষ্টা করলো, তখন ম্যাথু ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপেও দক্ষতা লাভ করলো। তাকে বন্দী করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে—সে জার্ম্মানদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর একটি গুপ্ত-দলের একজন উৎসাহী নেতা হিসাবে সে পরিচিত হোলো। সেই গুপ্ত-দলের পক্ষ থেকে অধিকৃত বেলজিয়ামে তরুণ যুবকদের বেলজিয়াম সৈন্যদলভুক্ত করা হোতো এবং একটি গুপ্ত পথে তাদের ডাচ্ সীমান্ত পার করিয়ে ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হোতো।

ম্যাথু অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করলো। তার শক্তি চরম উৎকর্ষতা লাভ করলো তার প্রাণ-শক্তি যেন ফেটে পড়লো। পূর্ব্বে সে দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবি ছিল, এখন সে

শক্তিমান ও প্রখর হয়ে উঠলো। তার হাসি জোরালো হোলো এবং একটা নতুন সুরে কেঁপে কেঁপে উঠলো।

হল্যাণ্ড থেকে ফিরবার সময় সে যখন সীমান্ত পার হচ্ছিল, তখন সে জার্মানদের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। একজন বৃদ্ধা ফ্লেমিশ চাষী তার নিজের ও পুত্রকন্যার জীবন বিপন্ন করে তাকে তার বাড়ীতে লুকিয়ে রাখলো। তারপর ভোরবেলা বৃদ্ধার কাছে সে যখন বিদায় নিল, তখন বৃদ্ধাটি বললো—আমাকে ধন্যবাদ দিও না। এই দুঃসময়ে আমরা সবাই ভাইবোন।—কথাটা ম্যাথুর খুব ভাল লাগলো, সে প্রায়ই বলতো—আমাদের দেশ যখন বিপদগ্রস্থ, তখন আমরা সবাই ভাইবোন।

কিন্তু শীঘ্রই তার ভুল ভাঙ্গলো। যখন সে তার দেশের ধনিকদের অর্থলিপ্সুতা ও দেশের মঙ্গলের প্রতি তাদের ঔদাসীন্য নিজের চোখে দেখলো, তখন সে একটা অপ্রীতিকর ও আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করলো। বহুবার সে দেখেছে—ধনী ও দরিদ্রকে একই উদ্দেশ্যে সমবেত করা প্রায় অসম্ভব। তার এই ধারণা হোলো, যে লোকের অবস্থা যত স্বচ্ছল, দেশের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কোন কাজ করা তার পক্ষে তত অসম্ভব।

ম্যাথুর মনে একটা অবিশ্বাস এলো। তার হাসির ভিতর আর কোন প্রাণ রইলো না এবং খুব কম সময়েই তাকে হাসতে দেখা যেত। এমন কি মাঝে মাঝে তার মনে অশুভ চিন্তা আনাগোনা সুরু করলো। সর্ব্বগ্রাসী আত্মাভিমানী এবং সর্ব্বস্বান্ত উপেক্ষিত ও নির্ভীক কর্ম্মী—এই দুই দলে দ্বিধাবিভক্ত তার দেশ। যে মুক্তির জন্য সে জনসাধারণকে অবিশ্রান্ত আহ্বান জানাচ্ছে, তার উপযুক্ত এদেশ নয়।

জার্ম্মান কবল হতে বেলজিয়ামের মুক্তি লাভের পর ম্যাথু দেশে ফিরে এলো এবং ধীর ও দেশপ্রেমিকের সম্মান লাভ করলো। কিন্তু শীঘ্রই সে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হয়ে উঠলো। চার বৎসরের দুঃখ, বিপদ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ম্যাথু আমোদ প্রমোদে গা ঢেলে দিল। তার প্রতিদিনের প্রমোদ-বিহার হাতাহাতিতে শেষ হোতো। যখনই ম্যাথু মাতাল হোতো, তখনই সে কোন বিশিষ্ট নাগরিকের সাথে মারামারি সুরু করে দিত।

একবার ছুটির দিনে, প্রাচীন প্রথামত, সহরে একটি ভোজন-প্রতিযোগিতা হোলো। বিজয়ীকে জেলার চ্যাম্পিয়ান ভোজনকারীর পদ দেওয়া হোতো। এমন সব প্রতিযোগীকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হোতো—যারা তাদের ভোজন পারদর্শীতার জন্য ইতিপূর্ব্বেই কৃতিত্বঅর্জ্জন করেছে এবং কোন ক্লাব বা দলদ্বারা সমর্থিত হয়েছে। স্কোয়ারে হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হোলো। প্লাটফর্ম্মের উপর খাদ্যদ্রব্যের ধ্বংসকার্য্য সুরু হোলো।

ম্যাথু বিজয়ীর সম্মান লাভ করলো। লোকে গল্প বলে—সে দুটো বড় হাঁস নাড়িভুঁড়ি সমেত সম্পূর্ণ উদরসাৎ করেছিল। জুরীদের চেয়ারম্যান ছিলেন মঁশিয়ে শ্লাকমেলডার ভ্যান্ স্টক ষ্ট্রাটেন—একজন বিশিষ্ট পশু-খাদ্য ব্যবসায়ী। তিনি ম্যাথুকে অভিনন্দন জানালেন। ম্যাথু প্রতিযোগিতার সময় যথেষ্ট পরিমাণে মদ্যপান করেছিল, সে সেই প্রশংসার কোন উত্তর না দিয়ে, হঠাৎ মঁশিয়ে শ্লাক্‌মেল্‌ডার ভ্যান্ ষ্টক্ ষ্ট্রাটেনের দাড়ি চেপে ধরলো।

—এইবার আমাকে বলো, এখন কেন তুমি দেশপ্রেমের গর্ব্ব করছো? আর জার্ম্মান অধিকারের সময় তাদের কাছে খাদ্য বিক্রী করে, জার্ম্মান মার্ক দিয়ে নিজের সিন্দুক তো বেশ বোঝাই করেছিলে?

ছুটির দিনে ম্যাথু হোতো দলের সর্দ্দার। মেরি-গো-রাউণ্ড এ ঘুরপাক খেতে খেতে তার আত্মবিস্মৃতি ঘটতো—কাঠের ঘোড়ার উপর সে বসে থাকতো, আর তার টুপি উড়তো, চুল উড়তো, গায়ের জামা উড়তো। তার মনে হোতো, গভীর একটা গহ্বর সে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। বন্দুক ছোঁড়ায় সে প্রথম হোতো। রবারের "মুর"এর উপর তার ঘুষির জোর ছিল সব চেয়ে বেশী। সেই ঘুষির ফলে রবারে "মুর" এত জোরে দুলে উঠতো যে, তার মাথাটা একটা স্প্রিংএ আঘাত করতো। সেই স্প্রিং একটা পিস্তলের ট্রিগারকে টিপে ধরতো—আর গুলির শব্দের সাথে সাথে দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠতো।

শীতকালে ম্যাথুর এই প্রমোদ-বিহার অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম সোমবারকে বলা হোতো "হারিয়ে যাওয়া সোমবার"—সেই দিনটা লোকে হৈ-হল্লা করে কাটাতো, মদ খেতো, মারামারি করতো। সেই রাত্রে

ম্যাথু নদীর ওপারে বিয়ার-হল ভেঙ্গে চুরমার করে দিলো, তার মাথার খুলি ফেটে গেল এবং তাকে বাড়ীতে ধরে নিয়ে আসা হোলো।

একমাস সে অসুস্থ অবস্থায় কাটালো,—তারপর সেরে উঠবার পর তার একটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটলো। আমোদ প্রমোদ একেবারে ছেড়ে দিল, গম্ভীর ও সংযত হয়ে উঠলো, মুখে চোখে একটা শান্ত ও নিরানন্দভাব ফুটে উঠলো।

ডাক্তারের পরামর্শে ম্যাথুর পিতা পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করলো। কিন্তু কনে কোথায়? এমন কেউ ছিল না, যাকে ম্যাথু ভালবাসে কিংবা যার প্রতি ম্যাথুর কোন টান আছে। মেয়েদের প্রতি তার কোন কৌতুহল ছিল না। সে ছিল শিশুর মত সরল। যখন বসন্তকাল এলো, ম্যাথুর পিতা তাকে কনের সন্ধানে ব্লিন্চ্ সহরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলো। ম্যাথুর বিশেষ সম্মতি ছিল না। কিন্তু তোড়জোড় করে একবার গেলে ক্ষতি কি?

প্রাচীন প্রথামত ছোট ওয়ালূন সহর ব্লিন্চ্ 'অল সেণ্টস্ ডে'তে পাণিপ্রার্থী যুবকদের সাদরে ও সসম্মানে স্বাগত আহ্বান জানাতো। ট্রেণ প্লাটফর্ম্মে ঢুকবার সাথে সাথে অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠতো। মেয়র অভিনন্দন বাণী জানাতো। তারপর সন্ধ্যার সময় স্কোয়ারে টেবিলের উপর থরে থরে খাবার সাজানো হোতো, আলো জ্বলে উঠতো এবং নাচ ও খেলা সুরু হোতো।

ম্যাথু এলো বটে, কিন্তু এই প্রাচীন রীতির প্রতি তার মনের ভিতর একটা প্রতিবাদ ছিল, এবং তার বহিঃপ্রকাশ হোলো এই যে, সে তার এক বিবাহিত বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

—তুমি বিবাহিত কি অবিবাহিত, একথা তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। ব্লিন্চ্ সহরের খরচে কিছুটা পানাহার এবং একটি সুন্দরী ওয়ালূন মেয়ের সাথে একটু নাচবার এই সুযোগ ছাড়বে কেন?

ব্লিন্চ্এ সেইদিন সন্ধ্যায় ম্যারি নামে একটি পিতৃমাতৃহীনা মেয়ের সাথে ম্যাথুর আলাপ হোলো। প্রথম সাক্ষাতেই ম্যাথু তার প্রেমে পড়লো। ম্যাথুর সেই প্রথম প্রেমের তীব্রতা ও গভীরতা শুধু সেই সব যুবকদের পক্ষেই সম্ভব, যারা জীবনে শুধু একবার ভালবাসে, যার মনে এর পূর্ব্বে কোন দোলা লাগেনি এবং

অন্য কারও প্রেমে পড়েনি। আর ম্যারিও ম্যাথুর প্রেমে পড়লো। ম্যারি প্রায়ই তাকে বলতো—তুমিও আমার প্রথম প্রেম।

কিছুদিনের মধ্যেই তাদের বিবাহের কথা ঠিক হয়ে গেল। ম্যাথু খুশী হোলো। প্রতি তিনদিন অন্তর সে তার প্রণয়িনীর সাথে দেখা করবার জন্য ব্লিন্‌চ্‌ সহরে যাতায়াত স্বরু করলো। একটা গভীর অনুভূতি তাকে আবার গম্ভীর ও সংযত করে তুললো।

সেপ্টেম্বর মাসে বিবাহের দিন স্থির হোলো। ম্যাথুর দেশের বাড়ীতে বিয়ে হোলো। কিন্তু সকলেই দেখলো, বিয়ের দিন কানের মুখে কেমন একটা ভয়ের ও আতঙ্কের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে।

বিয়ের রাতেই ম্যাথু কারও কাছে বিদায় না নিয়ে, কাউকে সঙ্গে না নিয়ে স্ত্রীকে ফেলে সহর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

ষ্টেশনে সে গার্ডের হাত দিয়ে পিতাকে একটা চিঠি লিখে পাঠালো। চিঠিতে ম্যাথু লিখলো—"কোথায় চলেছি, কবে ফিরব কিছুই জানিনা। কিন্তু যদি আমি কোনদিনও ফিরে না আসি, ম্যারিককে মেয়ের মত যত্ন কোরো এবং তাকে সান্ত্বনা দিও। সে অত্যন্ত দুঃখী। সে আমার অতি প্রিয় এবং সব কিছু।" তারপর পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, ঘেণ্টে যাবার টিকেট কিনবার জন্য সে গার্ডের কাছে দুই ফ্রাঙ্ক ধার করেছে, তার পিতা যেন সেটা দিয়ে দেয়।

গার্ড বললো—ম্যাথু তার বিয়ের পোষাকেই ছিল। মাথায় টুপি ছিল না। বাঁ পায়ে বাদামি জুতো ও ডান পায়ে কালো জুতো।

পরে শোনা গেল—ঘেণ্টে ম্যাথুকে নাবিকের পোষাকে দেখা গেছে। একটা ডিঙ্গিতে চড়ে সে খাল দিয়ে সমুদ্রের দিকে গেছে। কিন্তু বার্জেস, এ্যাণ্টোয়ার্প, কোথাও ম্যাথুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

সকলের ধারণা হোলো, ম্যাথু বেলজিয়ান কঙ্গোর দিকে সমুদ্র পথে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু সে পালিয়ে গেল কেন? কেউ কিছু বলতে পারলো না। ম্যারিককে যতবার প্রশ্ন করা হোলো, সে শুধু চোখের জল ফেললো।

ম্যাথু নিখোঁজ হবার পর লোকে অবশ্য ম্যারিককে দোষী করলো। লোকে

জোর করে এই কথা বললো, বিয়ের রাতে ম্যাথু নিশ্চয়ই একথা বুঝতে পেরেছে যে—যদিও সে নিজে নিষ্পাপ মনে ম্যারিকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু ম্যারিক অকলঙ্ক কৌমার্য্য নিয়ে তার কাছে আসেনি। এ কথা কে প্রমাণ করতে পারে?

ম্যাথুর পিতা এই অপবাদ বিশ্বাস করলো না। কিন্তু একাজ তার পক্ষে কত শক্ত ছিল এবং সন্দেহ তার মনকে কি পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল—ম্যারিক সেটা বুঝতে পারলো। ভ্যান্ একেনের বাড়ী ছেড়ে ম্যারিক চলে যেতে চাইল, কিন্তু পুত্রের শেষ অনুরোধকে মর্য্যাদা দিয়ে ম্যাথুর পিতা তাকে যেতে দিল না।

সময় কাটতে লাগল। ম্যাথুর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ম্যারিকের প্রতি লোকের বিদ্রূপ ও ঘৃণা স্তব্ধ হতে অনেক মাস সময় লাগল। ম্যারিকের প্রতি তার শ্বশুরের উদার বিশ্বাস, দেবর এ্যালবার্টের বিনম্র শ্রদ্ধা এবং পিসীমা লুসার বন্ধুত্ব—তাকে কৃতজ্ঞ করে তুললো।

একদিন ম্যারিক লুসাকে বললো, গত মহাযুদ্ধে ১৯১৭ সালে তার বয়স যখন চোদ্দ বছর, সে সময় একজন জার্ম্মান অফিসার তার পিতা ও মাতাকে প্রশ্নোত্তরের সময় গুলি করে মেরে ফেলে এবং তার দেহের উপর পাশবিক বলপ্রয়োগ করে নিজের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বিয়ের রাতে ম্যাথুর হাতে বন্দুক দিয়ে সে তাকে গুলি করতে বলেছিল। ম্যাথু শুধু চোখের জল ফেললো এবং একটি কথা না বলে চলে গেল।

লুসা বললো—নিষ্পাপ হয়েও তোমাকে সারা জীবন এই অভিশাপ বহন করতে হবে এবং লোকের উপহাস ও অবজ্ঞা কুড়িয়ে বেড়াবে…লোকের কাছে মুখ দেখাতে তোমার ভয় হবে…আর সে, তোমার ম্যাথু…সে কোনদিন ভুলতে পারবে না…কোন সান্ত্বনায় সে প্রবোধ মানবে না…ভ্যান্ একেনের বংশ…এরা এই রকম…কোন দাগ তাদের মন থেকে মুছে যায় না…তারা সবকিছু দীর্ঘকাল মনে করে রাখে...তারা এই ধরণের লোক…বেলজিয়ান…

তার এই দুঃসহ ও নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি ম্যারিকের মন তিক্ত হয়ে উঠলো। নিজের জীবনের নিষ্প্রভ ও নিরানন্দ ভবিষ্যতের কথাও তার মন থেকে মুছে গেল। সুদূর অতীতে যখন দুর্ভাগ্য তার জীবনকে চিহ্নিত করে যায়নি, সেই সব দিনের চিন্তা

তার একমাত্র আনন্দ ছিল। ম্যাথুর সাথে তার প্রেমের প্রথম কয়েকটা দিনের দ্রুত-সঞ্চারী কয়েকটা মুহূর্ত্ত তার মনে অক্ষয় হয়ে রইলো। যে দুরপনেয় গ্লানি তার সমস্ত জীবনকে বিতৃষ্ণায় ভরে তুলেছে, তার প্রতি সে বিস্মৃতি আনতে পারলো না। প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে হোতো—প্রতিটি চোখের দৃষ্টি তার এই গ্লানিকে আবিষ্কার করছে ও বিশ্লেষণ করছে।

যথাসময়ে "নীলচক্ষু দেবদূতে"র মত ম্যারিকের একটি ছেলে হোলো। পিতা ও মাতার প্রকৃতিগত শ্রেষ্ঠ অংশটুকু সে লাভ করলো। পিতার কাছ থেকে পেল—বুদ্ধিদীপ্ত, গভীর, প্রশান্ত দুটি চোখ এবং মাতার কাছ থেকে পেল—বিষণ্ণ হাসি, সুস্পষ্ট ভুরু এবং সুন্দর মুখাবয়ব।

পিতামহের নামানুসারে তার নাম রাখা হোলো—রেণী। পৌত্রের জন্মের পর বৃদ্ধ লোকটির মনে একই সাথে বিভিন্ন অনুভূতি বান ডেকে এলো। যেমন আনন্দ হোলো, তেমনি এই উৎসবের দিনে পুত্রের অনুপস্থিতহেতু দুঃখ হেলো। ম্যাথুকে এই খবর জানাবার ইচ্ছা হোলো, কিন্তু কেউ বলতে পারলো না—ম্যাথু কোথায় আছে। কয়েক বছর কাটলো। বৃদ্ধ লোকটির মনে এই দুঃখ রয়ে গেল। তারপর একদিন যখন সে নাতির বিছানার পাশে বসে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, সে সময় হঠাৎ হার্টফেল করে সে মারা গেল।

ম্যারিক তার ছেলেক একটা সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা নিয়ে আঁকড়ে ধরলো। পুত্রের জন্মের পর সে আবার তার জীবন ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি তার একটা ভীতি ছিল। তার ভয় ছিল, ভাগ্যের যে চক্রান্ত তার জীবনকে রেহাই দেয়নি, তার পুত্রকেও সে রেহাই দেবে না। তার পুত্রপ্রেম তাকে এক দিকে যেমন জীবন দান করলো, তেমনি জীবনের সাথে তার যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন করে দিল। জীবনের গভীর অন্তর্দ্দেশে একটা গোপনশক্তির উৎস তাকে সচেতনতা দান করলো এবং সে জানলো সে শক্তি একদিন ফেটে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু তার ঘৃণাও ছিল অতলস্পর্শী।

বৃদ্ধ ভ্যান একেনের মৃত্যু-সংবাদ বহন করে একটি স্থানীয় সংবাদপত্র ম্যাথুর হাতে পৌছল। সে তখন বহু দূর দেশে পরিব্রাজকের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারপরেই এ্যালবার্ট ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে লেখা ম্যাথুর একটা চিঠি পেল। চিঠিতে সে পিতার মৃত্যুর বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাইল এবং ম্যারিক জীবিত আছে কিনা খোঁজ করলো।

এ্যালবার্টের চিঠি যখন ম্যাথুর হাতে পৌঁছলো, তখন সে ক্যালিফোর্ণিয়া ত্যাগ করে চলেছে। দেশের দিকে যাবার ইচ্ছা তার ছিল না, সমস্ত পৃথিবীটা সে একবার ঘুরে দেখতে চায়।

তিন বছর ম্যাথু একটা খনিতে কাজ করেছিল। বহু দুঃখ ও অভাব সে সহ্য করেছে, বহু অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। দিনের কাজের পর সে নিঃসঙ্গতা এড়িয়ে চলতো। একটা সেলুনে বসে একগ্লাস পানীয় নিয়ে সে সন্ধ্যা কাটাতো। নিজের সম্পর্কে কোন কথা বলতো না; কিন্তু সঙ্গীদের কাছে তাদের দেশের জীবনের কথা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করতো। একজন রাশিয়ানের সাথে তার বন্ধুত্ব হোলো। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে লোকটি রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিল।

রাশিয়ায় সর্ব্বক্ষেত্রে যে মৌলিক পুনর্গঠনের কাজ স্থরু হয়েছে—সে সম্পর্কে যে সমস্ত খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রতি রাশিয়ানটি ম্যাথুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

জাতীয় সংগ্রাম ও জাতীয় ইতিহাসের প্রতি তীব্র সচেতনতা ও গর্ব্ববোধ ম্যাথুর একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ম্যাথু রাশিয়ার—শুধু বর্ত্তমান নয় অতীত সম্পর্কেও রীতিমত কৌতুহলী হয়ে উঠলো। রাশিয়ার ইতিহাস সম্পর্কে নানা বইয়ের উদ্ধৃত অংশ তার বন্ধু তাকে পড়ে শোনালো। বিশেষভাবে ম্যাথু আশ্চর্য্য হোলো, যখন সে শুনলো সাড়ে চার, পাঁচ, ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে যখন তার নিজের দেশ ফ্ল্যাণ্ডার্স অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, সে সময় রাশিয়ানরা এশিয়ার নোমাড্ যাযাবরদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যুদ্ধ করেছে এবং পশ্চিম ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রহরীর মত রক্ষা করেছে।

সেই আশ্চর্য্য দেশের নানা কাহিনী শুনে ম্যাথু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। তারা ঠিক করলো, তারা দু'জনে সেখানে যাবে এবং নিজের চোখে সেই অসাধারণ দেশ দেখবে।

কিন্তু যখন সে জানলো—দেশে তার একটি পুত্র হয়েছে এবং সে দিন দিন বড় হচ্ছে, তখন সে তার রাশিয়ান বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে এ্যালবার্টের চিঠি পাওয়ার দিনেই বেলজিয়াম রওনা হোলো।

দেশে ফিরে ম্যারিক ও তার পুত্রের সাথে যখন সে মিলিত হোলো, তখন তার যেন একটা নবজন্ম হোলো। তার মনে হোলো—সবকিছু সে আবার নতুন করে আরম্ভ করছে। এক রৌদ্রালোকিত বসন্ত দিনে সে যেন একটা কবর ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, মাঠে মাঠে সবুজ সতেজতা সে অনুভব করছে, সুরভিত অরণ্যের উত্তাপ তাকে কোমল ভাবে স্পর্শ করছে। যা কিছু দুঃখ সে সয়েছে, সব কবরের ভিতর সমাধি লাভ করেছে। নীল আকাশের তলে রৌদ্র-দীপ্ত পর্ব্বত-শিখর হতে যে মঙ্গল বাতাস বইছে, সে বাতাসে কবরের সেই বিষাক্ত মাটি দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

ম্যাথু হঠাৎ বুঝতে পারলো—তার দুঃখ কত অর্থহীন। মানুষের যে সহজ প্রেম, সেই প্রেমের গভীরতার কাছে ভাগ্যের আঘাত কত তুচ্ছ। জীবন-শক্তি নব নব জন্মের ভিতর ও নব নব বিজয় গৌরবে অপরাজেয়।

সে সব কিছু ভুলতে চাইল। তার জীবন-শক্তি এত তীব্র যে সে সব কিছু ভুললো। কিন্তু ম্যারিক কোন কিছু ভুলতে পারলো না। তার মুখে বিষাদের ছায়া তার চোখে ভয়ের দৃষ্টি, যেন প্রতি মুহূর্ত্তে সে নতুন দুর্ভাগ্য প্রত্যাশা করছে।

ম্যাথু যখন কারখানায় কাজে যেত, তখন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে তার পুত্রকে দৃষ্টির বাইরে রাখতো। রেণী যখন স্কুলে যাতায়াত সুরু করলো, তখন ম্যাথু ব্রুশেলস্‌এ গিয়ে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তার কাছে এই আবেদন জানালো তাকে সপ্তাহে দুদিন আধ ঘণ্টার জন্য কারখানা ত্যাগ করবার অনুমতি দেওয়া হোক। সকালে ম্যাথু নিজে রেণীর হাত ধরে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসতো, আবার ছুটির পর নিয়ে আসতো।

কিন্তু নিজের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে ম্যাথু নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিল না। ঘন বসতিপূর্ণ বেলজিয়ামের জনাধিক্যে সে হাঁপিয়ে উঠলো। ফ্ল্যাণ্ডার্স-এর পক্ষে তার হাত দুটোকেও অত্যন্ত দীর্ঘ বলে মনে হোলো।

—আমি যদি উত্তর দিকে হাত বাড়াই, তবে আমার আঙ্গুলগুলো ইংলণ্ড স্পর্শ

করে। দক্ষিণ দিকে—আমি প্যারিস পৌঁছুই। পূর্ব্বে—আমি হল্যাণ্ডের গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে আনতে পারি কিংবা প্রুশিয়ার মন্দিরের ঘণ্টা বাজাতে পারি।

আমেরিকানদের মত সেও চওড়া কোট পরতো—বেলজিয়ামে সেই রকম কোট এর আগে আর কেউ দেখেনি। আমেরিকান ধরণে দীর্ঘ ও দৃঢ় পদক্ষেপে সে পথ চলতো। বৃহত্তম সম্পত্তির মালিক কোন জমিদার, শ্রেষ্ঠতম ধনী কোন গর্ব্বিত নাগরিক—তারাও এভাবে পথ চলতে পারতো না। অভিবাদন করবার সময় সে ইউরোপীয় ধরণে হাত তলার দিকে ঠেলে দিত না, উত্তর আমেরিকার লোকের মত এধার থেকে ওধারে দোলাতো। তার বিশেষ কোন তাড়া নেই, একথা বোঝাবার জন্যই যেন সে এই অনুষ্ঠানটিকে দীর্ঘস্থায়ী করতো।

দুই ভাইয়ে প্রায়ই তর্ক হোতো। ম্যাথু প্রায়ই এই ভয় প্রকাশ করতো যে, জার্ম্মনরা আবার বেলজিয়াম আক্রমণ করবে, আর এ্যালবার্ট তার কথা শুনে হাসতো।

—ম্যাথু এটা যদি তোমার একটা মস্তিস্ক-বিকৃতির লক্ষণ হয়, তবে আমি তাকে ক্ষমা করতে রাজী আছি—রোগের উপর রাগ করে লাভ নেই—আর তা যদি না হয়, তবে আমি বলবো—তুমি তোমার পুরানো মতবাদ আঁকড়ে ধরে পিছিয়ে পড়ে আছ, তোমার কোন আশা নেই। একই গান বার বার গাইবার কোন অর্থ হয় না; সময়ের পিছনে পড়ে থেকে তুমি এক হাস্যকর নালিশ জানাচ্ছো।

—এ্যালবার্ট, কথা হচ্ছে এই, আমি পুরানো গানের পুনরাবৃত্তি করছি না, কিন্তু তোমার গানকে কোন ভাবে নতুন বলা চলে না। একথা সত্যি—আমি রাজনীতিবিদ্ নই, কিন্তু তবুও আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি। এই রকম ঘটনা কি আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসে নেই? বহু পূর্ব্বে—যখন বহু শতাব্দী ধরে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা বৈদেশিক শাসনে ছিল, তখন সম্ভ্রান্ত ফ্লেমিশ ধনিকদের লোভ, ধন-লিপ্সা ও তুচ্ছ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ স্বাধীনতা সংগ্রামকে কি দুর্ব্বল করেনি? জার্ম্মান অধিকৃত দেশে চারটি বছরের ভয়াবহতার ভিতর আমরা দিন কাটিয়েছি। আমরা যদি জার্ম্মানীর পাশবিকতার কথা এবং তার যুদ্ধ-পরিকল্পনার কথা সব সময় মনে করিয়ে দিই—তবে সেটা আমাদের দোষ নয়। আমাদের দোষ হচ্ছে, আমরা জার্ম্মানীর পরাজয়ের

কথা যতটা বলি, নিজেদের শক্তিকে মিলিত করবার অসামর্থ্যের কথা ততটা বলি না। যুদ্ধোত্তর যুগের নেতারা সকলেই আপন আপন সুখসুবিধা নিয়ে ব্যস্ত। জনসাধারণকে বিপদের জন্য প্রস্তুত করছো কি? কোন্ আদর্শ তুমি তাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল করে ধরবে? তাদের দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কি ব্যবস্থা তুমি করেছ? তাদের অতীত-বীরের অস্ত্র অকলঙ্ক রেখেছো কি? এই প্রশ্নগুলোই আমি তোমাকে করছি। জানি—তুমি উত্তর দিতে পারবে না। তুমি নিজেই তোমার বাগান নিয়ে অন্ধভাবে মেতে উঠেছ। পরম শান্তির ভিতর তুমি দিন কাটাচ্ছো। তোমার মনে কোন উচ্চাশা নেই। যা কিছু এই শান্ত নির্ব্বিবাদী ছোট সহরের সাথে সম্পর্কহীন—তার প্রতি তোমার কোন কৌতূহল নেই। পিসীমা লুসার ঘরে "ছোট বেলজিয়ামের বিরাটত্বের" মাত্রচিত্র দেখছিলাম। ঐ মানচিত্রটিকে দেওয়াল থেকে সরিয়ে ফেলার সময় কি আসে নি?

* * *

কয়েক বছরের পর যুদ্ধ সুরু হোলো!—কোন বাধা মানলো না।

দুই ভাই 'ক্ষুদ্র বেলজিয়ামের বিরাটত্ব' মানচিত্রের তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ম্যাথু অপেক্ষা করছিল।

—উত্তর দাও, এ্যালবার্ট। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে? জনসাধারণ অপেক্ষা করছে। তোমার মন স্থির করে ফেল। চলো, আমরা তাদের কাছে যাই।

—না, ম্যাথু, আমি যাব না···

এ্যালবার্ট তার ভাইয়ের উগ্র মেজাজের সাথে পরিচিত ছিল। সে সাবধানে দু'পা পিছিয়ে এলো। তার ভয় ছিল, তীব্র ক্রোধে ম্যাথু হঠাৎ জ্বলে উঠবে। সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। ম্যাথু যদি তাকে আঘাত করে, তবে সে আঘাত সে প্রতিরোধ করবে।

কিন্তু এ্যালবার্ট যা আশা করছিল, তা ঘটলো না। মাথা নীচু করে ম্যাথু হঠাৎ বসে পড়লো।

তখন সে বুঝতে পারলো, তার কথায় ম্যাথু কত বড় আঘাত পেয়েছে। কিন্তু সে কি করতে পারে? প্রবল চেষ্টায় আত্মদমন করে শান্ত সংযত ও বিষণ্ণ কণ্ঠে

ম্যাথু বললো—এই কি তুমি—আমার ভাই? তোমার কথা কি আমি শুনছি? তুমি কি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ?

তারপর সে বলতে সুরু করলো—কি ভাবে সে বেলজিয়ামের পথে পথে নিজের জীবন বিপন্ন করে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে দেখেছে, মালগাড়ী বোঝাই করে যুবতী মেয়ে—এমন কি শিশুদের পর্য্যন্ত ধরে নিয়ে চলেছে। জার্ম্মান অফিসার ও সৈনিকদের জন্য গণিকালয়ে তাদের জোর করে পাঠানো হবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সে দেখেছে—চাষীদের কাছ থেকে জার্ম্মানরা খাদ্যের শেষ টুকরো পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে। যে সমস্ত লোককে জার্ম্মানরা জামিন হিসাবে আটক করেছে, তাদের বাড়ীর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ম্যাথু এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, এই সব হতভাগ্য বন্দীদের জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে বিপন্ন।

এ্যালবার্ট তার দাদার কথায় বাধা দিয়ে বললো—তুমি কি মনে করো, আমি কিছু জানি না? আমি জানি—সব জানি। তোমার মত আমিও শিউরে উঠি। কিন্তু ম্যাথু, তুমি আমি আমাদের এই দুর্ভাগ্য ও এই পাপের বিস্তৃতি নিয়ে আলোচনা করবো না। আজ যখন দেখতে পাচ্ছি—এই পাপকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না, তখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত—কিভাবে এর তীব্রতাকে হ্রাস করা যায়।

ম্যাথু হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর তার দীর্ঘ বাহুদু'টি প্রসারিত করে ধীর ও শান্ত স্বরে বললো—তুমি ভ্যান্ একেন বংশের ছেলে, একথা কি ভুলে গেছ? এ্যালবার্ট, তোমার মৃত্যু ঘটেছে; শুধু তোমার শবদেহ চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। বিশ্বাসঘাতকতার পথে তুমি পা বাড়িয়েছ। কিন্তু আমি তোমায় বাঁচাবো। তুমি আমার ভাই, তোমাকে আমি ভালবাসি। ভাগ্যের হাতে তোমাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। তোমাকে আমি আমার পথে নিয়ে আসবোই।

ম্যাথুর এই ধীরতা ও সংযম এ্যালবার্টের উপর গভীর রেখাপাত করলো। তার মনে হোলো—ম্যাথু কত শক্তিমান, নিজের উপর ম্যাথুর কি গভীর বিশ্বাস। আর সে নিজে—সে কত নিষ্ফল ও কত ব্যর্থ।

স্থির আত্মবিশ্বাসে ম্যাথুর মন ভরে উপ্‌চে উঠলো। কিন্তু এ্যালবার্ট মনে মনে নানা যুক্তি খুঁজে বেড়ালো।

—ম্যাথু, আমার কথাটা শান্ত হয়ে শোনো। সর্ব্বস্ব পণ করবার আগে আমি দেখতে চাই,ঘটনার গতি কোনদিকে···নগরের প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা করবার দায়িত্ব আমার উপর···তার নিরাপত্তা আমি বিপন্ন করতে রাজী আছি···কিন্তু কি জন্য? জয়লাভের জন্য···যদি সে নিশ্চয়তা থাকে···কিন্তু যখন যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটেছে, তখন এই ঝুঁকি নেওয়া—না ম্যাথু, আমি তা চাই না···এই যুদ্ধে জয়ের পাল্লা কাদের দিকে ঝুঁকেছে—সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত হতে চাই···

ম্যাথু উত্তেজিত হয়ে উঠলো। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে সে লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে সে ফিস্ ফিস্ করে—যেন কেউ না শুনতে পায়—বললো—ছিঃ এ্যালবার্ট, তোমার দেশপ্রেমকে তুমি যাচাই করতে চাও? ভাড়াটে গুণ্ডারা নানাদিক ভেবে মন স্থির করে। যাঁরা দেশের খাঁটি সন্তান, তারা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সংগ্রাম করে। তাঁরা জানে—আপন শক্তিতে ও আপন শৌর্য্যে তাঁরা জয়লাভ করবে। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলাফলের উপর কি দেশপ্রেম নির্ভর করে? নিজের স্বার্থ-সিদ্ধিকে কি তুমি দেশপ্রেমের মাপকাঠি করতে চাও? তাই যদি হয়—তাকে মা'র প্রতি ছেলের ভালবাসা বোলো না, তার নাম নীচ বণিক মনোবৃত্তি। আমাদের জয়লাভে যে সন্দেহ প্রকাশ করে, তার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। জয়ের উপর যে দৃঢ় আস্থাশীল, তার মনে কোন সংশয়, কোন দ্বিধা থাকবে না। আমার স্থির বিশ্বাস—আমাদের জয়লাভ হবে। বিজয়ীর দৃষ্টি নিয়ে আমি সব কিছু দেখি।

—আর ম্যাথু, আমিও জয় কামনা করি···কিন্তু জয়ী যদি না হই?···বিবাদ করে বিপদ ডেকে আনবার কোন অধিকার আমার আছে কি?

—বিবাদ? তোমার শত্রুর সাথে তুমি কি বহুপূর্ব্বেই বিবাদ সুরু করোনি?

—একবার ভেবে দেখ, ম্যাথু, রাশিয়ানরা যদি মস্কো ত্যাগ করে, তবে যুদ্ধ সেইখানেই শেষ।

—মস্কোর পতন হবে না। একে তুমি ভাগ্য বলো, ঘটনার স্বাভাবিক গতি বলো, সত্যের প্রতিষ্ঠা বলো—কিন্তু মস্কো প্রতিরোধ করবেই। দেশের প্রতি ও নিজেদের উদ্দেশ্যের প্রতি একটা বলিষ্ঠ ও অক্ষয় বিশ্বাস নিয়ে রাশিয়ানরা এগিয়ে

চলেছে। নিজেদের দেহ দিয়ে তারা শত্রুর মেসিনগানের মুখ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করবার জন্য তারা ট্যাঙ্কের তলায় বুক পেতে দিয়েছে। নিজেদের ঘরবাড়ী সহর কারখানা পুড়িয়ে ফেলেছে···অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দিয়ে তৈরী সব কিছু উড়িয়ে দিয়েছে। তারা সব ক্ষতি সহ্য কারছে, কোন প্রিয় বস্তুর প্রতি কোন মমতা রাখেনি। এ্যালবার্ট, একে বলে অন্তরের মহত্ব। মৃত্যুহীন, ক্ষয়হীন—অগ্নিশুদ্ধ। নোমাড্ যাযাবরদের আক্রমণের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করবার জন্য পাঁচ শতাব্দী ধরে তারা এক মুহূর্তের জন্যও অস্ত্র ত্যাগ করেনি। পশ্চিমে আমরা যখন গীর্জ্জা তৈরী করেছি, টাউনহল সৃষ্টি করেছি, দুর্গ খাড়া করেছি, প্রাসাদ বানিয়েছি, সে সময় অক্লান্ত, বিনিদ্র ও সদাসতর্ক প্রহরীর মত রাশিয়ানরা আমাদের রক্ষা করেছে। আমাদের জন্য, আমাদের বেলজিয়ামের জন্য, রাশিয়ার রণক্ষেত্রে যে রক্তপাত হচ্ছে ও যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি, তাকে ভুলবার কোন অধিকার আমাদের আছে কি? এ্যালবার্ট, আমি পূর্ণ বিশ্বাসে মস্কোর দিকে তাকিয়ে আছি। রাশিয়ানদের কাছে আমি নির্ভীক দেশপ্রেমের শিক্ষা নিতে চাই। দেশের প্রতি, গ্রামের প্রতি, জীবন ও মৃত্যু, স্নেহ ও ভালবাসার প্রতি—তোমার প্রতি, স্ত্রীর প্রতি এবং পুত্রের প্রতি আমার যে মনোভাব, তার সততাকে আমি তাদের দৃষ্টান্ত দেখে বিচার করি। সর্ব্ব দুঃখ ও বিপদের জন্য আমি নিজেকে প্রস্তুত করেছি। দুঃসহ দুঃখ যেখানে নেই, খাঁটি জীবনের সন্ধান সেখানে পাওয়া যায় না।

—কিন্তু ম্যাথু, দুঃসহ দুঃখ কি, তা কি তুমি জান? একবার আমাদের গীর্জ্জা, আমাদের টাউনহল, আমাদের শিল্পের কথা ভাব—তাদেব হারানোর দুঃখ কি তুমি বোঝ? পৃথিবীতে কোন শক্তি, কোন প্রচেষ্টা কোন কালে এদের নতুন করে সৃষ্টি করতে পারবে না। এ চিত্র কি তুমি মনে মনে কল্পনা করতে পার? একে তুমি অনুভব করতে পারো কি?

ম্যাথু উত্তর দিতে চাইলো, কিন্তু দিল না। সে একপাশে সরে এসে ভাইয়ের দিকে পিছন ফিরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—তারপর একটি কথা না বলে ঘরের ভিতর পায়চারী করতে লাগল।

একটা ভারী ও অনড় স্তব্ধতা দুই ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে রাখল। ম্যাথু কি ভাবছে?

ম্যাথু আবার দেওয়ালের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর পকেট হাতড়ে একটা চিঠি বার করে এ্যালবার্টের দিকে একবারও না তাকিয়ে তার হাতে দিল।

—চিঠিটা পড়। তারপর চুপ করে থেকো। আমাকে একটি কথা বোলো না।

চিঠিটা রেণীর বন্ধুদের লেখা—ছোট কয়েক লাইনের চিঠি।

"আমরা জানি—এই চিঠিটা পেয়ে আপনি দুঃখিত হবেন ও চোখের জল ফেলবেন। আমাদের পক্ষেও চিঠিটা লেখা সহজ নয়; তবুও লিখতে হবে। আপনার রেণীর মৃত্যু হয়েছে। জার্মানরা তার উপর অত্যাচার করেছে। সে ইংলণ্ডে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। মিড্‌লক্লার্কের সমুদ্র-তীরে সে একটি জার্মান রক্ষীর গুলিতে আহত হয়। তারা তার উপর অত্যাচার করে এবং তার মৃতদেহ বালির উপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সমুদ্রের ঢেউ তার দেহকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।"

চিঠিটা এ্যালবার্ট বারবার পড়লো। তার গলা দিয়ে কান্না ঠেলে বেরিয়ে আসছিল।

বহুক্ষণ দুই ভাই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কথা বলতে গা কেঁপে উঠলো, পরস্পরের উপস্থিতি অনুভব করতে ভয় হোলো। ঘরের ভিতর একটা গভীর স্তব্ধতা ঘন হয়ে উঠলো। কিন্তু তবুও সেই নিঃশব্দতা তাদের দুজনকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করলো না।

বাইরে সন্ধ্যার আলো ধীরে ধীরে মুছে গেল। একটা কালো অন্ধকার পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এসে ঘরের ভিতর ঢুকলো।

এ্যালবার্ট সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, পারলো না। শরীরের ভার এক পা থেকে আর এক পায়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তার ছিল না। কথা বলে সেই দীর্ঘ মুহূর্ত্তের গভীর মৌনতাকে ভঙ্গ করতে তার ভয় হোলো।

হঠাৎ সে চীৎকার করে বললো—ম্যাথু, আমি যাব। আমাকে তোমাদের দলে ধরতে পার।

ম্যাথু মাথাটা একটু নীচু করে ইঙ্গিতে জানালো, সে শুনতে পেয়েছে। তারপর

সে তার ভাইয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসল এবং তার কাঁধের উপর হাত রেখে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এ্যালবার্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সচেতন বলে মনে হোলো না।

ম্যারিক ও তার পিছনে লুসা ঘরে ঢুকলো।

ম্যারিক বললো—আমাদের ছেড়ে তোমরা এতক্ষণ এখানে কি করছ? আমার বড় ভয় করছে। আর একি, তোমরা অন্ধকারে বসে আছ কেন?…ম্যাথু, কি হয়েছে আমাকে বল। তুমি ওকে ধরে আছ যে? কথা বলছো না কেন? কোন বিপদ ঘটেছে? একি, এ্যালবার্ট কাঁদছে কেন?

—না ও চোখের জল নয়। আমি কাঁদছি না।

—ম্যাথু, আমাকে বলো কি হয়েছে।

—না ম্যারিক, কিছু না…

—তোমার কথা শুনে আমি বুঝতে পারছি…রেণী? তার কোন বিপদ হয়েছে? সে বেঁচে আছে তো? ম্যাথু, আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না। আমার বড় ভয় হচ্ছে, ম্যাথু।

—ম্যারিক, আমার কাছে এসে বোসো। লুসা, তুমিও বোসো…

—ম্যাথু, কথা বলো, চুপ করে থেকো না, কথা বলো, ম্যাথু…

—ম্যারিক, বলবার কিছু নেই। আমি বলবার আগেই তুমি নিজেই সব বুঝতে পেরেছ…

ম্যারিক চীৎকার করে উঠলো।

—সে কি বেঁচে নেই? না, না, এ হতে পারে না…আমি বিশ্বাস করি না…

—ম্যারিক, রেণী আর নেই, ওকে খুন করেছে…

—হায় ভগবান! আমার বড় ভয় হচ্ছে…বাঁচাও…একটা কিছু করো, ম্যাথু… আমার বড় ভয় হচ্ছে…ম্যাথু, ম্যাথু…না, না, এ হতে পারে না। তুমি কি করে এ খবর জানলে?

—আমার কাছে একটা চিঠি আছে, ম্যারিক।

—ওটা আমাকে দাও। আগে দাওনি কেন? কেন লুকিয়েছিলে? আমার

কাছে লুকোবার কি অধিকার আছে? আমাকে চিঠিটা দাও। ওটা আমার, আর কারও নয়, আমার, আমার। যেটা সব চেয়ে দরকারী, তাই তুমি আমার কাছ থেকে নিষ্ঠুরের মত লুকিয়ে রেখেছ।

ম্যাথু তার হাতে চিঠিটা দিল; ম্যারিক সেটা পড়ল। তারপর নিঃশব্দ একটা কান্নায় তার শরীর ফুলে ফুলে উঠলো।

—কেঁদো না, ম্যারিক। তোমাকে বাঁচতে হবে···এ সব সত্বেও তোমাকে নিশ্চিতভাবে···

ম্যাথু কথা বললো, কিন্তু কথা বলবার সময় সে একটা শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করলো। তার সেই প্রাণঘাতী বেদনাকে আড়াল করবার চেষ্টায় তার গলায় কথা আটকে গেল; স্বর বিকৃত, কর্কশ ও অদ্ভুত হয়ে উঠলো। একটা প্রবল কান্নার মত কথাগুলি তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। শিউরে উঠে সে চুপ করলো। ম্যারিক আরও ভয় পেয়ে গেল এবং একটা নিঃশব্দ বিলাপ ও শোকাবহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

লুসা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার হঠাৎ ছুটে এসে ম্যারিককে বুকে জড়িয়ে ধরলো—যেন ম্যারিককে সে বাঁচাতে চায় এবং ম্যাথুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

—ম্যাথু, তুমি কি বুঝতে পারছ না, তুমি কত নিষ্ঠুর···ওকে এবার বাঁচানো শক্ত হবে। ও এবার নিশ্চয়ই মরবে···তাকিয়ে দেখছ কি? কত বড় ভুল করেছ বুঝতে পারছো? এ খবর তো ঠিক নাও হতে পারে, তুমি জানলে কি করে? না, এ খবর কখনও সত্যি নয়···রেণীকে আমি মানুষ করেছি—ও কত ভাল ছেলে, ওর মত ছেলে আর হয় না···

ঠিক সেই সময় সদর দরজায় কে যেন 'নক্' করলো। ম্যাথু ও ম্যারিক সেটা শুনতে পেল না। শব্দ আরও জোরে হোলো।

সেই শব্দ এ্যালবার্ট সর্ব্বপ্রথম শুনলো। সে লাফিয়ে উঠলো—কে যেন কড়া নাড়ছে।

লুসাও সেই শব্দ শুনলো—হ্যাঁ ঠিক, কে যেন কড়া নাড়ছে।

—এইবার দরজায় লাথি মারছে। নিশ্চয়ই জার্ম্মানরা আবার এসেছে—লুসা অসহায় ভাবে চারদিকে তাকালো—হা ভগবান! আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

—পিসীমা, তুমি গিয়ে দরজাটা খুলে দাও, আমি ম্যাথু ও ম্যারিককে লুকোবার ব্যবস্থা করছি।

—এ্যালবার্ট, আমার ভয় করছে, আমি যাব না।

এ্যালবার্ট ম্যাথুর দিকে ছুটে গেল—যত তাড়াতাড়ি পার এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। জার্ম্মানরা আবার এসেছে। ম্যাথু, ম্যারিক, কথা শোনো, উঠে দাঁড়াও। নিজেকে বাঁচাও, ম্যাথু। আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছ না…ম্যাথু…ম্যাথু… তোমার হোলো কি?…পালাও, ম্যারিককে নিয়ে পালিয়ে যাও…তাড়াতাড়ি… জার্ম্মানরা এসেছে। আমার কথা কি বুঝতে পারছ না? শুনছো, শোন ম্যাথু, আমার কথা শোনো…ম্যাথু…ম্যাথু!

দরজার শব্দ হঠাৎ থেমে গেল, তারা নিশ্চয়ই দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকেছে। লুসাকে ফিস্ ফিস্ করে ম্যাথু বললো—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের পালিয়ে যেতে বলো…আমি যাচ্ছি, যতক্ষণ সম্ভব ওদের আমি আটকিয়ে রাখব।

এইবার ম্যাথু সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। সে সেই ভালুকের মূর্ত্তিটা সরিয়ে ফেললো এবং ম্যারিকের হাত ধরে গুপ্ত ঘরের প্রবেশ পথের দিকে অগ্রসর হোলো।

—ম্যারিক, চল আমরা পালিয়ে যাই…জার্ম্মানরা দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকেছে… চল তাড়াতাড়ি যাই।

ম্যারিক উঠে দাঁড়ালো। তার চোখমুখের ভাব খুব শান্ত, কিন্তু পিঠ নুয়ে পড়েছে, যেন কোন দুর্ব্বহ বোঝা তার পিঠের উপর চাপানো হয়েছে।

—ম্যাথু, আমি আসছি · আমি আসছি…তোমাকে ধরতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব…

নীচে নামবার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ম্যারিক হঠাৎ থামলো—না, আমি যাব না, যেতে পারব না…আমি ফিরে যাচ্ছি…

—ম্যারিক, তুমি তাহলে আর ফিরে আসতে পারবে না…

—না, না, ওই ঘরে সব আছে…রেণীর সমস্ত স্মৃতি…ম্যাথু, আমি পরে আসব…

—ম্যারিক…এ্যালবার্টকে জিজ্ঞাসা করো কোথায়…

ম্যারিক কোন কথা শুনলো না। কথা বলবার আগেই সে গুপ্তপথের মুখ বন্ধ করবার হাতলটা তুলে ধরলো। ম্যাথুর ইচ্ছা হোলো, স্ত্রীকে একটু আদর করে, কিন্তু একটা তীব্র বেদনাবোধ তাকে বাধা দিল। প্রকৃত দুঃখের সময় মানুষের মনে অন্য কোন ভাব থাকে না। ম্যাথুর মনে হোলো, স্ত্রীকে যদি সে এখন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, সেই নিঃশব্দ সান্ত্বনাও ম্যারিক সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না। ম্যাথু নীচে নেমে গেল আর ম্যারিক হাতলটা এঁটে দিল।

এ্যালবার্ট সদর দরজা খুলে দিল। পাথরের মেঝের উপর লোহা-লাগানো বুটের ধাতব শব্দ জেগে উঠলো। ম্যারিক এবং লুসা সিঁড়ি দিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল।

মেজর, ক্যাপ্‌টেন্, সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনা এবং আরও প্রায় দশটি সৈনিক হলঘরে ঢুকলো। ফিলিপ এবং বার্ণার্ড—যারা মিউজিয়ামের জিনিষগুলি লরি-বোঝাই করেছিল—তাদেরও সেই দলে দেখা গেল।

মেজরকে রীতিমত ভীত ও শঙ্কিত বলে মনে হোলো। সে ক্যাপ্‌টেনকে বাড়ী সার্চ্চ করবার আদেশ দিল। এ্যালবার্টের মনে হোলো, জার্ম্মানরা তাদের সেই পুরানো খেলা এখনও ছাড়েনি। আবার বোধ হয় তার বিরুদ্ধে "নগরের সম্পত্তি চুরি"র অভিযোগ আনা হবে।

দলে দলে বিভক্ত হয়ে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বেঁটে লোকটির সঙ্গে একদল গেল মিউজিয়ামের দিকে, ক্যাপটেনের সঙ্গে আর একদল গেল লুসা ও ম্যারিকের ঘরের দিকে, সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনা ও তিনটি সৈনিক গেল ছাদের দিকে—আর ভ্যান একেনকে অনুসরণ করতে বলে মেজর এ্যালবার্টের লাইব্রেরীর দিকে এগিয়ে চললো।

ডেস্কের সামনে মেজর বসলো এবং একটা আর্মচেয়ারের দিকে এ্যালবার্টকে ইঙ্গিত করলো। এই আর্মচেয়ারে এ্যালবার্ট সাধারণতঃ আগন্তুকদের বসতে বলতো।

একটি কথা না বলে মেজর ডেস্কের ড্রয়ারগুলি একটির পর একটি খুললো। একটা ড্রয়ার থেকে সে এক টুকরো কাগজ টেনে বার করলো কিন্তু একবার তাকিয়েই সে আবার কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তাকে দেখে মনে হোলো, বাড়ী সার্চ করার ব্যাপারে প্রথম থেকেই তার বিরক্তি ধরে গেছে।

মেজর তার পা দুটো ছড়িয়ে দিল, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকালো, পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলো, তারপর হাত দিয়ে সামনের ডেস্কের খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেললো। তার সেই দ্রুত হাতচালনায় ওয়ালুন মিনিয়েচারটি ছিট্‌কে মেঝের উপর পড়লো। এই মিনিয়েচারটিকেই এ্যালবার্ট সকালবেলা ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পরীক্ষা করছিল।

এ্যালবার্ট তাকিয়ে দেখল। তার ইচ্ছা হোলো, ওয়ালুন মিনিয়েচারটিকে সে কুড়িয়ে নেয়, কিন্তু জোর করে সে ইচ্ছা সে দমন করলো।

—হের ভ্যান্ একেন, ব্যস্ত হয়োনা। ও জিনিসটা মাটিতে গড়াগড়ি দিক, তাতে আমি মোটেও দুঃখিত নই। কিন্তু আমি কেন তোমাকে এ ঘরে ডেকে আনলাম জান? সহরের প্রাচীন স্মৃতি সম্পর্কে তুমি তো বেশ মনোযোগী আর আমাদের সার্জেণ্ট মেজর মাগুনা রাউণ্ড টাওয়ারে কতগুলো পুরানো নথি-পত্র খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং আমি আদেশ দিয়েছি যেন সেগুলি তোমার হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। ওগুলো তুমি পড় এবং যত্ন করে রেখে দিও। দেখছ তো, তোমাকে আমরা কত বিশ্বাস করি।

এ্যালবার্ট কোন কথা বললো না। মেজর অত্যন্ত ক্লান্তভাবে গা এলিয়ে দিল। সে একবার কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে হাই তুললো ও চোখ বুজে শুয়ে রইল। কিন্তু তারপরেই সে হঠাৎ হিংস্রভাবে লাফিয়ে উঠে এ্যালবার্টের দিকে ছুটে এলো।

—তোমার দাদা কোথায়?—মেজর চীৎকার করে উঠলো।

মেজরের ছেলেমানুষি দেখে এ্যালবার্ট হেসে উঠলো।

—আমার দাদা কোথায়, সে খবর আমি জানি না।

—ভ্যান্ একেন্, কথা চাপবার চেষ্টা কোরো না, আমি সব জানি। তুমি মনে করছো, তুমি আমাদের হয়েও কাজ করবে আর সঙ্গে সঙ্গে অপর দলকেও সাহায্য

করবে! ছেলেমানুষি! ভুল! এ সব ধারণা মন থেকে মুছে ফেল, নইলে তোমার ঐ মাথাটি সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব।

—আমার দাদার খবর আমি জানি না। আমি সত্যি কথাই বলছি।

—আমি সত্যি কথাই বলছি! দরজা খুলতে তোমার এত দেরী হোলো কেন? তোমাকে আমি বলে রাখছি, যদি ঐ বদমাসটা এখানে এসে থাকে, তবে সে কিছুতেই পালাতে পারবে না। বুঝতে পারছ? যদি সে মনে করে থাকে—এখানে সে ডেরা বাঁধবে, তবে সে বড় দেরী করে ফেলেছে। তোমার সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করবার আদেশ আমি দিয়েছি। বুদ্ধিতে সে আমার কাছে শিশু। তোমার এই বাড়ীতে আমরা কম্যাণ্ডাণ্টের অফিস* তুলে আনব। আর হ্যাঁ, তোমার বৌদি কোথায়?

—এখানে।

—এখানে কোথায়?

—যেখানে সে ছিল—এই বাড়ীতে।

—মিথ্যা কথা। সে তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেছে। সত্যি কথা কি করে বলতে হয়, সে শিক্ষা আমি দিতে জানি। এই বেতখানা এর আগে দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

মেজর বেত তুললো। এ্যালবার্ট শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্যাপটেন ঘরে ঢুকলো।

—স্ত্রীলোকটি কোথায়? মেজর জিজ্ঞাসা করলো—পালিয়ে গেছে তো?

—আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, মহিলাটি তার ঘরে এখানেই আছেন। যখন তার ফ্যামিলি ফটোগ্রাফগুলি আমরা নিলাম, সে কাঁদলো ও আমাদের অভিশাপ দিল।

—বাঃ বাঃ, ক্যাপটেন, বেশ কথা, ভাল কথা। আর ভ্যান্ একেন, আমি সত্যিই বিশ্বাস করছি, তুমি তোমার দাদার খবর জান না। তবে কি জান, গ্রামের অবস্থা বড় খারাপ। কোন কিছুর স্থিরতা নেই। কোথায় যেন কি

* সেনাপতি-শিবির—অনুবাদক

হচ্ছে। লোকগুলোর চোখে কিরকম যেন……ঠিক…নতুন একটা উত্তেজনা…
কিন্তু তুমি একটা স্বর্ণ সুযোগ পেয়েছ, আমাদের প্রতি তোমার আনুগত্য দেখাবার এই হচ্ছে সময়…

মেজর ড্রয়ারের ভিতর হতে এক টুকরো কাগজ বার করলো :

—এই কাগজটায় লেখ, ভ্যান্ একেন।

—কি লিখতে হবে আমি জানি না।

—জান না? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ। এখনও তুমি জান না? ক্যাপটেন তোমাকে মনস্থির করবার জন্য একঘণ্টা সময় দিয়েছে। আর এখন তিনঘণ্টা পার হয়ে গেছে। যখন আমরা কাউকে চিন্তা করবার সময় দিয়ে যাই, সেটা তার মুখে থেকে 'না' শুনবার জন্য নয়, আমাদের দাবীর প্রতি তার স্বীকারোক্তি পাবার জন্যই।

—আমি ভালভাবে চিন্তা করে দেখেছি। তোমাদের অধীনে আমি কোন কাজ করতে রাজী নই।

উত্তেজিত হয়ে মেজর টেবিলের উপর আঙ্গুল ঠুক্‌লো। তার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো। বাঁ দিকের বুক-পকেট থেকে সে একটা চুরুট টেনে বার করলো। তার মাথাটা সে দাঁত দিয়ে কাটলো এবং এ্যালবার্টের দিকে থুঃ থুঃ করলো। তারপর চুরুটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে তার গন্ধ শুকলো এবং হঠাৎ সেটা কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করে ক্যাপ্‌টেন খুসী হয়ে উঠলো। যাদুকর যখন ভেল্‌কি দেখায়—তখন যেমন লোকে হাসে, ঠিক সেই রকম হাসি তার মুখে ফুটে উঠলো।

ক্যাপ্‌টেনের হাসি মেজর লক্ষ্য করলো। সে দৃশ্যটিকে দীর্ঘতর করে তুললো। এইবার ডানদিকের বুক-পকেট থেকে সে আর একটি চুরুট বার করলো এবং কাগজের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেলে সেটা ক্যাপ্‌টেনকে সে দেখালো।

—চয়েস্ হাভানা।

চুরুটের মাথাটুকু কামড়ে ফেলে দিয়ে মেজর ঘণ্টা বাজালো।

সার্জেণ্ট মেজর মাগুনা ঘরে ঢুকলো।

—মাগুনা, ফিলিপ ও বার্ণার্ডকে এখানে আসতে বলো আর আমাকে একটা দেশলাই দাও।

কথাটা বলে মেজর উঠে দাঁড়ালো। গোলাপী-গাল ও বেঁটে সৈনিক দুটি ঘরে ঢুকলো।

মেজর ইঙ্গিতে তার চুরুটটা দেখালো। গোলাপী-গাল সৈনিক একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে চুরুটের নীচে ধরলো আর মেজর জোরে একটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

এ্যালবার্টকে দেখিয়ে অত্যন্ত অলসভাবে মেজর বললো—এই বেলজিয়ানটাকে সরিয়ে নিয়ে যাও। ওকে গুলি করে মারবার জন্য প্রস্তুত করে রাখ। আমি নিজে গিয়ে গুলি করবার আদেশ দেব। আর ক্যাপ্টেন, এই হতভাগাটাকে গুলি করবার জন্য কোথায় টেনে নিয়ে যাবে? এই বাড়ীর পাশেই শেষ করে ফেলা যাক। তোমার মত আছে? বেশ ভাল কথা। আমি নিজে জায়গা বাছব। বার্ণার্ড, ওকে নিয়ে যাও।

এ্যালবার্টকে সঙ্গে করে সৈনিক দুটি চলে যাবার পর মেজর হাসলো।

ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কি সত্যিই ওকে গুলি করতে চাও?

—ও জাহান্নমে যাক্। আমাদের আর কোন কাজে ও আসবে না। তাছাড়া লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বিরক্তি ধরে যায়। আর আমাদের সেনাবাহিনীর পক্ষে লোকটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতেও পারে।

—কিন্তু আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলি। আবর্জ্জনা হলেও, লোকটা এখনও কাজে লাগতে পারে।

—তুমি কি ওর হয়ে ওকালতি করছ নাকি? সাবধান ক্যাপটেন, তুমি নরম হয়ে পড়ছ।

মেজর হেসে উঠলো।

—আরে না মেজর, তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না। আমি খুব খুসী হয়েছি—বেলজিয়ান স্ত্রী-লোকটির এই অনভিপ্রেত অভিভাবকটিকে সরিয়ে ফেলবার পর সে আমার রক্ষাণাধীনে থাকবে।

—আমার মনে হয়, স্ত্রীলোকটিকে এবার আমাদের জামিন হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। তুমি কি বলো ক্যাপ্‌টেন? সহরে এই কথাটা প্ল্যাকার্ড মেরে ঘোষণা করে দাও। ওর বদমাস স্বামীটা একথা শুনুক। সমস্ত লোক একথা জানুক। ওদের ইতিমধ্যেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, কিন্তু আমি এমন শিক্ষা দিতে চাই—যেন আর টুঁ শব্দ করতে না পারে। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন, সত্যি তোমার কি মনে হয়? হয়ত ওর স্বামী এ বাড়ীতে একেবারেই আসেনি? হয়ত আমরা মিথ্যা গুজব শুনেছি? হয়ত সহরের লোকেরা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নেই? কি? তোমার কি মনে হয় ক্যাপ্‌টেন? হয়ত আমরা মিথ্যা ভয় পেয়েছি? হয়ত এসব কোন কথা সত্যি নয়? হয়ত তোমার এবং আমার উচিত এখন দু'তিন বোতল ভাল সাদা ওয়াইন নিয়ে কিছুক্ষণ স্ফূর্তি করা? শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিতে দোষ কি?......মহিলাটিকে ডেকে আন......সে আমার কোলে বসুক...কি বলো ক্যাপটেন?

—পানাহার কেন চলবে না? সাদা ওয়াইন আমি কখনও প্রত্যাখ্যান করি না। আমি এখনই 'গ্র্যাভ্‌' এর অর্ডার দিচ্ছি। কিন্তু বেলজিয়ান স্ত্রীলোকটির প্রতি নজর দিও না। সে আমার।

—কেন তোমার?

—কারণ, ওকে তোমার কাছ থেকে আমি চেয়ে নিচ্ছি।

—তোমার এই অনুরোধ আমি অগ্রাহ্য করছি। স্ত্রীলোকটিকে আমি নিজের জন্য নিলাম।

—মেজর, এই প্রথম তোমার কাছে কোন কিছুর জন্য আমি হাত পেতেছি।

—আর এই প্রথম তোমাকে আমি প্রত্যাখ্যান করলাম।

—তোমার জন্য আমি অনেক কিছু করেছি, মেজর।

—ক্যাপটেন, ছেলেমানুষি কোরো না। আমি তোমার উচ্চতর অফিসার। যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য আমি ভাগবাঁটোয়ারা করব।

—মেজর, মনে রেখো—তোমার কাজে আমাকে প্রয়োজন হতেও পারে।

—লাঠিতে ভর না দিয়েও আমি চলতে পারি, ক্যাপটেন।

—মেজর, এটা কি তোমার মিথ্যা আত্মগর্ব্ব নয় ?

—ক্যাপ্‌টেন, নিজেকে তুমি ভুলে যাচ্ছ।

—ক্ষমা চাইছি। কিন্তু তবুও আমি বলব, তুমি যা ভাবছ সহরের অবস্থা অতটা শান্ত নয়। তুমি বদরাগী ও দায়িত্ববোধহীন। অত্যন্ত সহজে তুমি প্রতারিত হও, শত্রুর হাতে তুমি পুতুল মাত্র।

—তুমি কি বলতে চাও ? আমার নামে এই রকমের রিপোর্ট তৈরী করছো নাকি ?

—আর তুমি কি বলতে চাও মেজর ? তোমার এই দায়িত্ববোধহীনতা হেডকোয়ার্টারকে জানাবো না ? তাই যদি হয়, সেকথাটা ঠিক করে আমাকে বলো, আমি ভেবে দেখব। নইলে রাশিয়ার রণক্ষেত্র তোমার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করে রয়েছে...

মেজর জোর করে হাসলো।

—আঃ ক্যাপটেন, তুমি বড় সহজে চটে যাও। এস, একটা রফা করা যাক।

—আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করছি না, মেজর। ফুরারের প্রতি এবং রাইখের প্রতি আমার কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করেই আমি সবকিছু বলছি ও করছি।

—ঠিক, ঠিক, ক্যাপ্‌টেন, তুমি ঠিক কথা বলেছ। এসো একটা রফা করা যাক। আমি কি বলতে চাই জান ? এস আমরা মহিলাটিকে নিয়ে বাজী ধরি। সেটাই সৈনিকোচিত হবে। জাহান্নমে যাক ! এস আমরা মহিলাটিকে নিয়ে টস্ করি।

ক্যাপ্‌টেন মেজরকে ঘুষ হিসাবে একটা মোটা টাকা দিতে চাইল। কিন্তু মেজর কোন কথা শুনলো না, টস্ করতে চাইল। একটা হিংস্র একগুঁয়েমি তাকে পেয়ে বসল। তাকে দেখে মনে হোলো—লাফিয়ে উঠে সে এখনি ক্যাপ্‌টেনের টুঁটি টিপে ধরবে। ক্যাপ্‌টেন টস্ করতে রাজী হোলো।

ক্যাপ্‌টেন পয়সাটা টস্ করলো। পয়সা মাটিতে পড়ে গড়াতে গড়াতে আর্মচেয়ারের তলায় চলে গেল। দুজনেই ঝুঁকে পড়লো। নীচু হবার সময় দুজনের কাঁধ স্পর্শ করলো। সেই স্পর্শতে দুজনেই দুজনের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ অনুভব করলো।

"টসে ক্যাপ্‌টেন জিতলো। পয়সাটার দিকে তাকিয়ে সে মেজরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। মেজর এক লাথি দিয়ে পয়সাটা দূরে সরিয়ে দিল।

—বাজে পয়সা! তোমার মত লোকেরা…সব সময়েই টসে জেতে…আমার বিরুদ্ধে তুমি প্রথম থেকেই রিপোর্ট পাঠাচ্ছ। তুমি কি মনে করো—আমি কিছু জানি না?…

—তুমি কোনদিন কোন জিনিষের ভাগ আমায় দিয়েছ? যা কিছু পাও, নিজে একা ভোগ কর।

—আর ক্যাপ্‌টেন, তুমি? তুমি সৈনিকের উপযুক্ত নও,…তুমি একটা ইঁদুর…ছোটখাটো একটি ব্যুরোক্র্যাট্‌…নিষ্কর্ম্মা…তুমি কল্পনার রাজ্যে বাস করো…দার্শনিক…গল্পবাজ…প্লুটোক্র্যাট্। তোমার মত লোককে ফুরার ফাঁসী দেবার আদেশ দেবে। তোমার মত লোকের সঙ্গে কথা বললেও সময় নষ্ট করা হয়। স্ত্রীলোকটিকে তুমি কিছুতেই পাবেনা। একবার ভাবো দেখি যে, একটা বাজে পয়সার খাতিরে আমি সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম।

—তুমি কি একে সৈনিক-মনোবৃত্তি বলো? তুমি নিজেই টস্ করবার কথা বলেছিলে।

—আচ্ছা বেশ, আমি একথা বলেছিলাম তো? আমি একবার বলেছিলাম —আবার এখন মত পরিবর্ত্তন করছি।

—এটা খুবই বীরত্ব, সন্দেহ নেই।

—কিন্তু বোকার মত আমরা কি কোনদিন প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করব? স্ত্রীলোকটি আমার। তোমার কখনই হতে পারে না। এই হচ্ছে শেষ কথা। নইলে আরও অনেক উপায় আমার জানা আছে…যেমন ধরো, কথা বলতে বলতে তোমার যদি কোন খেয়াল না থাকে, বা তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়—তবে তুমি রেহাই পাবে না…বুঝতে পারছো? …আর তোমার এই বয়সে যা স্বাভাবিক তাই হবে…আর এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে তোমাকে আমরা করব দেব।

ক্যাপ্‌টেন বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মেজরের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা নিষ্ফল

ভীরু ক্রোধে সে কেঁপে কেঁপে উঠলো। আর মেজর নিতান্ত অবজ্ঞাভরে হাতের বেতটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

ক্যাপটেন বললো—মেজর, লোকে জানে, তোমার ও আমার ভিতর গভীর ও সৈনিকোচিত বন্ধুত্ব আছে। লোকে মিথ্যা ধারণা করেনি, আমরা দুজনে একসঙ্গে বহু জিনিষ দেখেছি ও বহু কাজ করেছি। আমরা ঝগড়া করবো না। আমি স্বেচ্ছায় এই স্ত্রীলোকটিকে তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

এরপর মেজর ও ক্যাপ্‌টেন হৃষ্ট ভাবে কয়েক বোতল বসন্ত-পুষ্পের মত সুগন্ধি, শরতের শান্ত সূর্য্যাস্তের মত সোনালী গ্র্যাভ পান করলো।

বার্ণার্ড ও ফিলিপ এ্যালবার্টকে নিয়ে হলঘরে অপেক্ষা করছিল।

বার্ণার্ড অভিযোগ করলো—ক্যাপটেনের মুখ চেয়ে আমাদের মত সৈনিকদের হাঁ করে বসে থাকতে হয়। বিনা কারণে আমরা নানা দুর্ভোগ সহ্য করি। সে সোজাসুজি কাউকে গুলি করতে চায়না—টেনে টেনে নিয়ে চলে। কেন?

ফিলিপ হেসে বললো—লোকগুলির ভালোভাবে শিক্ষা হোক—যেন তারা কোনদিন ভুলে না যায়।

—কিন্তু ওদের কাছে কোন প্রভেদ নেই। শূয়ারগুলি কাদাতে গা ডুবিয়েই তো আছে। মিথ্যে এত ঝঞ্ঝাট পোহাবার কি দরকার? যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়, বাতাস তত পরিষ্কার হবে।

এ্যালবার্ট তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভাবতে চেষ্টা করলো। কিন্তু নিজের মনকে সে সংযত করতে পারলো না। নানা ছোটোখাটো কারণে তার মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটলো। ফিলিপের গোলাপী গাল আর বোকার মত মুখ, বার্ণার্ডের ছোট বাঁকানো পাদুটো, এমন কি তার খুক্ খুক্ কাশি—যেটা সে প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করছিল—সব কিছু তাকে বিরক্ত করে তুললো।

এ্যালবার্ট মনে মনে এই ভেবে খুসী হোলো যে, তার জীবনে আর কোন সমস্যা নেই। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সবকিছুর পূর্ণ-সমাপ্তি ঘটলো। তবুও সে

মনে মনে সমস্ত ঘটনা বারবার ভেবে দেখলো। সে চেয়েছিল, জার্মানদের সঙ্গে বুদ্ধির খেলা সুরু করবে, সময় নেবে আর যুদ্ধের গতিপথে কোন অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকবে। এমন সময় ম্যাথু এলো। আর একবার এ্যালবার্ট তার সমস্ত ঘৃণা নিয়ে উদ্ধত ও রূঢ় জার্মানদের বিরুদ্ধে উগ্রভাবে জ্বলে উঠলো। এ্যালবার্টের মনে হোলো, হয়ত সে ঠিক করেনি, হয়ত এই খেলার হারজিত পর্য্যন্ত তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন আর এসব হিসাব ও বিবেচনার সময় নেই, প্রয়োজনও নেই। হঠাৎ এ্যালবার্টের মনে হোলো, তার এই মৃত্যু সম্পূর্ণ অর্থহীন। সে চেয়েছিল—নগরীর প্রাচীন স্মৃতিগুলি অক্ষত রাখতে, হয়ত একাজ সে ভালোভাবেই করতে পারত, কিন্তু ম্যাথুর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি সমস্ত ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিল। এ্যালবার্টের মনে বড় দুঃখ হোলো।

হঠাৎ এ্যালবার্ট নিজের চিন্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো। তার এই মানসিক অধঃপতন কেন? মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তার দুঃখ কি এতই স্থূল? কোন বিরাট ও মহৎ উদ্দেশ্যে সাহসে ভর করে সে কি উঠে দাঁড়াতে পারে না? নিজের মৃত্যুকে সে এভাবে কল্পনা করেনি নিশ্চয়ই? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার এই যে নিস্পৃহতা—এর কারণ কি সর্ব্বগ্রাসী অবসাদ? ম্যারিক সম্পর্কেও কি তার কোন দুশ্চিন্তা নেই? ম্যাথু? এ্যালবার্ট কেঁপে উঠলো।

এ্যালবার্ট প্রথমে লক্ষ্য করেনি যে, হলের ভিতর ক্রমশঃ বহু লোক ঢুকছে। তারা কেউ একা আসছে, কেউ দলে দলে আসছে। সদর দরজায় ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া গেল, মনে হোল—বহু মোটর এসে দাঁড়িয়েছে।

আগন্তুকদের মধ্যে সকলেই অফিসার। দেখে মনে হোলো, তারা বহুদূর থেকে আসছে।

তাদের এই নিঃশব্দ আগমনে এ্যালবার্ট আশ্চর্য্য হোলো। কেউ কোন কথা বলছে না। সকলেই কেমন বিষণ্ণ। কয়েকজন শীতে জড়াজড়ি করছিল। কিংবা হয়ত শীত নয়—কোন মানসিক আতঙ্কে তারা কাঁপছিল। মনে হোলো, কোন অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য লোকগুলোকে নাড়া দিয়ে গেছে। লোকগুলো বোধ

হয় এখানে থামবেনা, এগিয়ে যাবার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে। এ্যালবার্টের প্রতি কেউ কোন মনোযোগ দিল না।

এমন সময় একজন কর্ণেল ঢুকলো। লোকগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। কর্ণেল কারও দিকে না তাকিয়ে সার্জেন্ট মেজর মাগুনার সাথে এ্যালবার্টের লাইব্রেরীর দিকে সোজা চলে গেল। সেই ঘরেই মেজর ও ক্যাপটেন ছিল।

এ্যালবার্টের মনের দুর্ব্বহ কালো বিষণ্ণতায় একটা আশার আলো জ্বলে উঠলো। শত্রুপক্ষের একটা কিছু দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে বোধ হয়।

কর্ণেলকে লাইব্রেরী-ঘরে পৌছে দিয়ে মাগুনা ফিরে এল। তারপর বার্ণার্ড ও ফিলিপকে আদেশ দিল, এ্যালবার্টকে নিয়ে তারা যেন একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তোমাদের বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। মেজর খুব ব্যস্ত।

বার্ণার্ড সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করলো, মেজরের অনুপস্থিতিতে তারা কি এ্যালবার্টকে গুলি করতে পারেনা?

মাগুনা বললো—না।

* * *

ভূগর্ভস্থ কক্ষ হতে বেরিয়ে আসবার মুখে যে একটা ঝোপের আড়াল ছিল, ম্যাথ্ তার ফাঁক দিয়ে একবার উঁকি মারল। সে দেখল, কাছেই নদীর ধারে একজন জার্মান প্রহরী এবং আর কিছুটা দূরে বাগানের কাছে আর একজন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাথ্ বুঝলো, সমস্ত স্থানটিকে জার্মান বাহিনী ঘিরে ফেলেছে। সে স্থির করলো, কুয়াশা আরও ঘন হয়ে উঠুক, ততক্ষণ সে গুপ্তকক্ষে অপেক্ষা করবে।

তার মনে ভয় হোলো—ম্যারিক, এ্যালবার্ট আর লুসার ভাগ্যে কি আছে কে জানে। উপরের ঘরে উঠে যেতে তার সাহস হোলো না। হয়ত বাড়ী সার্চ্চ করা হচ্ছে, হয়ত অন্য কোন বিপদ আছে।

চারদিকে একটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ। কোথায় যেন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। তার একঘেয়ে অলস শব্দ একটা দীর্ঘ নির্দ্দিষ্ট সময় পার হয়ে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে।

উপর থেকে একটা চাপা অস্পষ্ট কলরব মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল। বাড়ীর ভিতর কি যে ঘটছে—সেই শব্দ শুনে সে সম্পর্কে কোন ধারণা করা অসম্ভব। সে শুধু অস্পষ্ট একটা গোলমাল ও মাঝে মাঝে দু'একটা গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিল।

ম্যাথু একটা পাথরের উপর বসে সেই শব্দ কান পেতে শুনতে লাগল। চারদিক অন্ধকার, চোখদুটো অভ্যস্ত হয়ে উঠলো—কিন্তু তবুও সেই অন্ধকার এতটুকু কম বলে মনে হোলো না।

সেই বদ্ধ ঘরে বসে বসে ম্যাথু শ্রান্তিতে ভেঙ্গে পড়লো। মাথাটা বুকের কাছে নুয়ে পড়লো এবং একটা ঘুমে-ভরা অচেতনতায় সে ডুবে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে আবার চমকে জেগে উঠলো। একটা অকল্পিত আশঙ্কায় সে থর থর করে কেঁপে উঠলো। তার মনে হোলো, তার ঠিক মাথার উপর কোথায় কে যেন একটা আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

উপরের ঘরে ছুটে যাবার জন্য সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আর একবার কান পেতে সে শুনলো। কোথাও কোন শব্দ নেই, চারদিক নিঃশব্দ। আবার সে পাথরটার উপর বসে পড়লো। তার সমস্ত ক্লান্তি ও আচ্ছন্নভাব একেবারে কেটে গেল। শুধু শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা ভীতিপ্রদ আশঙ্কা ভারী হয়ে উঠলো। তার মনে হোলো, তার শরীরের ভর সহ্য করবার জন্য একটি অস্থিও আর অবশিষ্ট নেই।

সে চিন্তা করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তার পুত্রের মৃত্যুর পর শুধু একটিমাত্র চিন্তাই তার মস্তিষ্ক জুড়ে আছে—রেণী আর নেই ; রেণী বেঁচে নেই কেন ? এটা যে ঠিক তার চিন্তা, তাও নয়। সে শুধু নিজেকে অনবরত প্রশ্ন করতো—একি সত্যি ? একি সত্যি ? রেণী কি ফিরে আসবেনা ? এর কি কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় ? এমন কিছু কি হয় না যে, পূর্ব্বেকার অবস্থা আবার ফিরে আসে ?

এই ভয়ঙ্কর সংবাদ পাবার পর থেকে রেণীর চিন্তা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারেনি। একাই হোক বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেই হোক, কোন কাজে ব্যস্ত থাকুক বা না থাকুক—সব সময়ে তার মনের গভীর প্রদেশে একটিমাত্র চিন্তা,

রেণী নেই। আর এই চিন্তা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতো—যখন ম্যাথু কোন কাজে, কোন আলাপ আলোচনায় বা কোন চিন্তায় গভীরভাবে ডুবে যেত। কোন জরুরী বিষয়ের আলোচনায় হয়ত ম্যাথু কোন কথা বা যুক্তি মনে করতে চেষ্টা করছে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার মনে এই চিন্তা এসে তাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুল্‌ত—এই দেখ, তুমি নিজের চিন্তায় আর নিজের বন্ধুবান্ধব নিয়ে ডুবে রয়েছ, কিন্তু রেণী বেঁচে নেই! রেণী বেঁচে নেই কেন? সে কি কোনদিন ফিরে আসবে না?

আর যদি কোন সময়ে এই বেদনার তীক্ষ্ণতা তার কাছে কম মনে হোতো, তবে সে প্রখর হয়ে উঠতো—যে পবিত্র ও নিষ্পাপ শোককে সে তার জীবনে শ্রেষ্ঠতম ও পরমতমরূপে পেয়েছে, তার থেকে নিজেকে বিচ্যুত করবার কোন অধিকার তার আছে কি?

এই শোকের ভিতর দিয়ে সে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করলো। জীবন তার চোখে তুচ্ছতর কিন্তু মহত্তর হয়ে উঠলো। লোকের প্রতি সে ক্ষমাশীল ও বিনয়ী হয়ে উঠলো, তার প্রেম গভীরতর হোলো। জনসাধারণকে নির্ব্বোধ বলে মনে হোতো না, কিন্তু তারা তার চোখে আরও তুচ্ছ হয়ে গেল। দেশের প্রতি, পরিচিতের প্রতি তার কর্ত্তব্যবোধ অধিকতর সচেতন হোলো। যদিও জীবনের প্রতি তার শাশ্বত প্রেম অম্লান রইলো, কিন্তু তবুও নিজের জীবনী-শক্তি সম্পর্কে তার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিলনা। এই কারণেই যে মুহূর্ত্তে কাজ করবার সুযোগ ঘটলো, সে তার নিজের দেশে ফিরে এলো। কিন্তু ফিরে এসে সে বুঝতে পারলো—সে তার ক্ষতকে তীক্ষ্ণতর করে তুলেছে। এখানকার সব কিছু রেণীর স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলছে।

সেই অন্ধকারে আর সেই দুঃসহ নিস্তব্ধতায় একা বসে থাকতে থাকতে ম্যাথুর মনে নানা চিন্তার উদয় হোলো। নিজের চিন্তাতে নিজেই সে কেঁপে উঠলো—এ্যালবার্টকে যদি সে হারায়, তবে তার অবস্থা কি হবে? ম্যারিকের কথা কল্পন করতেও সে ভয় পেল। আর লুসা? সেও তার জীবনের একটা অংশ। হঠাৎ তার চিন্তার একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটলো। বোধ হয় ভয়ে—কিংবা হয়ত সাহসে। সাহসে ভর করে সে সমস্ত সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড়াবে—তার দেশ? বেলজিয়াম? সে কি চিরকাল শৃঙ্খলিত থাকবে? কার প্রতি তার বিশ্বাস? কোথায় তার

প্রেম? কি নিয়ে তার স্বপ্ন? আবার তার চিন্তা সরে এলো। এবার খুব কাছে, উপরের ঘরে জার্ম্মানদের সম্পর্কে···যাই ঘটুক, যে সুপরিকল্পিত কর্ত্তব্যের দায়িত্ব নিয়ে সে এখানে এসেছে, সেই পথে সে শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হবে। ম্যাথুর চিন্তাধারার আবার একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ঘটলো। সে কল্পনায় নিজের যৌবনকালে ফিরে গেল। রেণীর হাত ধরে সে রাস্তা দিয়ে চলেছে। সেই পরিচিত রাস্তা, যে রাস্তা সে শিশুকাল থেকে চেনে। রেণী তার হাত ধরে স্কুলে চলেছে—আর তাকে অজস্র প্রশ্ন করছে। সে প্রশ্নের বিশেষ কোন বিষয়-বস্তু নেই—আর সে প্রশ্নের শেষও নেই। কিন্তু ম্যাথু ঠিকমত জবাব দিচ্ছে না। প্রশ্ন সম্পর্কে সে মোটেও চিন্তিত নয়, সে শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—রেণীর মাথার সুন্দর চুল, আর তার উত্তেজিত দুটি চোখ। সেই প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখদুটিতে বসন্তের বিভাষ আর আকাশের নীলিমা ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ আর একবার ম্যাথুর মনে হোলো, কোথায় কে যেন আর্ত্ত চীৎকারে কেঁদে কেঁদে উঠছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে সে শুনবার চেষ্টা করলো—কিন্তু জলের শব্দ ও নিজের হৃতপিণ্ডের ধুক্ ধুক্ শব্দ ছাড়া অন্য কিছু সে শুনতে পেল না।

*　　　*　　　*

ওদিকে ক্যাপ্‌টেন্, মেজর আর সদ্য-আগত কর্ণেল,—এই তিনজনে এ্যালবার্টের লাইব্রেরী ঘরে বসে আলোচনা করছিল।

কর্ণেল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তার চোখদুটো জ্বলছিল ও অঙ্গভঙ্গি দ্রুত ও ধারালো হয়ে উঠেছিল। জামার বোতাম ও হাতের দস্তানা না খুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথা বলছিল। কর্ণেলের শরীর রোগা ও লম্বা, গায়ের রং হলদেটে, চেহারায় জার্ম্মানের চেয়ে ফরাসীদেশীয় আদল বেশী। এমন কি তার নামের ভিতরেও ফরাসী টান ছিল—লেতুলেৎ।

মেজরও দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ চোখ বিবর্ণ, ভীত।

রক্ষী-সৈন্য ও রেল জংসনের অধিনায়ক হিসাবে মেজর কর্ণেলের কাছ থেকে দুটি আদেশ-পত্র পেল। একটিতে লেখা—রুশ রণক্ষেত্রে যে সমস্ত সৈন্য স্থানান্তরিত হবে, তাদের জার্ম্মান সীমান্ত পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য ভোরবেলা ট্রেণ

প্রস্তুত রাখতে হবে। তা'ছাড়া কর্ণেল লেতুল্লেতের অধীনে যে বাহিনী উত্তর ফ্রান্স হতে ট্রাক্-এ আসবে—তাদের জন্য ট্রেণ বন্দোবস্ত করতে হবে।

দ্বিতীয়টি এই—ট্রেণের বন্দোবস্ত করবার পর রক্ষীবাহিনী ও রেল জংসনের কর্ত্তৃত্ব ক্যাপটেন ল্যুরাদ্-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি কর্ণেল লেতুলেতের আদেশের জন্য অপেক্ষা করবে। কর্ণেল লেতুলেৎ তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে রওনা হবে।

ক্যাপ্‌টেনও এই মর্ম্মে এক আদেশ পত্র পেল যে, মেজর পূর্ব্ব-রণক্ষেত্রে রওনা হবার পর তাকে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। আদেশ পত্রটি পাবার পর ক্যাপ্‌টেন টেবিলের ওপাশে যে আর্ম-চেয়ারে মেজর এতক্ষণ বসেছিল, সেইখানে গিয়ে বসলো।

কিন্তু তবুও ক্যাপ্‌টেন খুব খুসী হোলো না এবং কর্ণেলের প্রতি যথোচিত ভদ্রতা প্রকাশ করতে পারলো না। সে বুঝতে পেরেছিল—কর্ণেল বেডেন-এর অধিবাসী। একজন প্রুসিয়ান হিসাবে সে বেডেনবাসীদের পছন্দ করতো না। বেডেনবাসীরা অধঃপতিত ফ্রান্স দ্বারা প্রভাবান্বিত—এই মত সে পোষণ করতো। তাছাড়া ক্যাপ্‌টেনের কতগুলি কুসংস্কার ছিল। সে বিশ্বাস করতো—যদি কোন বেডেনবাসীর হাত থেকে তুমি কোন নতুন পদ লাভ করো, তবে তোমার শুভ হবে না।

কর্ণেল উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে কথা বলছিল। হেড্‌কোয়ার্টার্স-এ যে সমস্ত খবর পাওয়া গেছে, সেগুলি সে তাদের জানালো। যে কোন মুহূর্ত্তে মস্কোর পতন হতে পারে। উত্তরে জার্ম্মানবাহিনী ভল্‌গা খাল পার হয়েছে। পশ্চিমে জার্ম্মান ট্যাঙ্ক একেবারে মস্কোর উপকণ্ঠে উপস্থিত হয়েছে। দূরবীণের ভিতর দিয়ে ক্রেমলিন প্রাসাদ স্পষ্ট দেখা যায়। ফুরার ইতিমধ্যেই রেড স্কোয়ারে কুচ্‌কাওয়াজের খবর ঘোষণা করেছেন।

পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে যাবার কথায় কর্ণেল অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলো। যুদ্ধের উন্মাদনার কথা সে বর্ণনা করলো। সে আরও বললো, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু হবার পর সেখানে তাকে পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে সে তার উপরওয়ালাকে অতিষ্ঠ

করে তুলেছিল। সে জানে—রণক্ষেত্রেই তার টিউটনিক রক্ত-পিপাসা ও যুদ্ধোন্মাদনা তৃপ্ত হবে।

—আমি অনুরোধের পর অনুরোধ জানিয়েছি। অবশেষে আমার আকাঙ্ক্ষা সফল হয়েছে। যুদ্ধ-দেবতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি ঈপ্সিত পথে পা বাড়িয়েছি।

কর্ণেলের মুখে এই সমস্ত কথা শুনে ক্যাপ্‌টেন আরও বিরক্ত হয়ে উঠলো। ক্যাপ্‌টেনের বিরক্তির আরও কতগুলি কারণ—কর্ণেলের গায়ের রং পরিষ্কার নয়, কোমর সরু, ক্যাপটেনের মত তার ভুঁড়ি নেই এবং সব চেয়ে বড় কথা এই যে, কর্ণেল যে ধরণের কথাবার্ত্তা বলছে, তা একমাত্র একজন খাঁটি প্রুসিয়ানের মুখেই শোভা পায়। রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হবার কোন সম্ভাবনা যদি না থাকে—তবে ক্যাপটেন্ নিজেও এইরকম উদাত্ত স্বরে কথা বলতে পারে।

ক্যাপ্‌টেন আরও বিরক্ত হোতো—যখন সে দেখতো, প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের তুলনায় এই যুদ্ধে সেনা-বিভাগ অনেক জটিল। সে নিজেও সব সময় বুঝে উঠতে পারতো না, তার কি করা উচিত। তার সামরিক জীবনে চিরকালই সে প্রাচীনপন্থী। সে বলতো—পৃথিবীতে জার্ম্মানীর স্থান শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র জার্ম্মানীর শীর্ষদেশে প্রুসিয়ার স্থান। এমন এক সময় ছিল—যখন প্রুসিয়ান্ বলে তার পরিচয়কেই তার চাকুরী ও পদোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ততা বলে মনে করা হোতো। কিন্তু এখনকার এই জাতীয়-সমাজতন্ত্রীরা সমস্ত রীতিনীতি পাল্‌টে দিয়েছে। এখন আর শুধু প্রুসিয়ান হলেই চলে না। অল্পবয়স্ক অফিসাররা যেমন ফুরারের মতামতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে, ক্যাপটেনের পক্ষে সেভাবে চলা সহজ নয়। সুতরাং সে প্রুসিয়ান হয়েও সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। এই কর্ণেল লেতুলেৎ-এর মত লোকদের সে পথ দিয়েছে, যদিও এরা এখনও বালক মাত্র এবং প্রুসিয়ান তো নয়ই—হয় ব্যাভেরিয়াবাসী বা বেডেনবাসী, কিংবা হয়ত তার চেয়েও খারাপ।

কোন কারণ নেই, ক্যাপটেন মনে মনে ভাবলো, কেন সে এখনও শুধু একজন ক্যাপ্‌টেন মাত্র—আর ঐ নির্ব্বোধ মেজরটা তার চেয়েও উঁচু পদে? তা'ছাড়া বেডেনের এই শয়তান লেতুলেৎ তো এর মধ্যেই একটা কর্ণেল!

প্রায় সব সময়েই ক্যাপ্টেনের মনে এইরকম প্রতিক্রিয়া হোতো। চাকুরীতে সামান্য কোন পদোন্নতি তাকে তার ব্যর্থ চাকুরী-জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আহত ও ক্রুদ্ধ করে তুলতো।

এই সমস্ত চিন্তার ফলে ক্যাপ্টেন উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। সে কর্ণেলকে জানালো, ভোরবেলার মধ্যে ট্রেণ প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না। বেলজিয়ান রেল-শ্রমিকদের ভিতর শৃঙ্খলা ও আদেশানুবর্ত্তীতা নেই, চারদিকে অশান্তি ও অব্যবস্থা। জার্ম্মান কর্ত্তৃত্বের প্রতি কারও মনে কোন ভীতি বা শঙ্কা জেগে ওঠেনি।

কথাগুলি বলে ক্যাপ্টেন মনে মনে খুসী হোলো, কারণ—কর্ণেল ও মেজর, তার দুজন শ্রোতাই এই কথাগুলি শুনে সমান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

মেজর চীৎকার করে বললো—ক্যাপ্টেন ল্যুরাদ্ সত্যি কথা বলছে' না। বেলজিয়ানদের দিয়ে আমরা যা চাই, তাই করিয়ে নিতে পারি।

কর্ণেল লেতুলেৎ সমর্থন-সূচক হাসলো—সে তো বেশ ভাল কথা, মেজর। তুমি কি করতে চাও?

—যদি তারা আমাদের কথামত কাজ না করে, তবে এই সহরটাকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্নভাবে উড়িয়ে দেব।

ক্যাপ্টেন তার কাঁধের একটা ভঙ্গি করে হাতদুটো ছড়িয়ে দিল।

কর্ণেল হেসে বললো—মেজর শোনো, তুমি সত্যিই খুব চমৎকার লোক। কিন্তু ভুলে যেও না, কাল ভোরের মধ্যে আমাকে রওনা হতেই হবে। ভয় দেখিয়ে এত তাড়াতাড়ি কার্য্যোদ্ধার হবে না। ধরো, তুমি সব লোককে গুলি করে মেরে ফেললে; কিন্তু তাহলে তো কাজ চলবে না। আমাদের প্রয়োজন—এই মুহূর্ত্তে তারা কাজে লেগে যাক এবং গাড়ীর কামরাগুলি সাজাতে স্থরু করে দিক।

—জাহান্নমে যাক, মেজর অসহায়ভাবে বললো, একথাটা আমার মাথায় আসেনি।

কর্ণেল লেতুলেৎ দস্তানাশুদ্ধ হাত দিয়ে মেজরের পিঠ চাপড়ে বললো—মেজর, আমি তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক স্থানে পাঠাবো। তুমি একজন ভাল যোদ্ধা

হতে পারবে। কিন্তু এখন আমি বাধ্য হয়ে ক্যাপটেনের শরণ নেব। তুমি কি করতে চাও, ক্যাপটেন ?

ক্যাপ্‌টেন হাসলো—কর্ণেল, হেডকোয়ার্টার্সে তুমি জানতে পেরেছ যে, এই সহরে দয়ার ভাব প্রকাশ করাই ভুল হয়েছে। তার উপর যে সব বেলজিয়ানদের দিয়ে আমাদের কাজ করানো যেত, তাদের কাজে লাগানো হয় নি।

—ক্যাপ্‌টেন সে সব আমি জানি। কিন্তু এক্ষুনি এই মুহূর্ত্তে, এতটুকু সময় নষ্ট না করে তুমি কি করতে পার, তাই আমাকে বলো।

এই কথা শুনে ক্যাপ্‌টেন মাগুনাকে ডেকে পাঠালো।

—ভ্যান্ একেনকে কি গুলি করা হয়েছে? হয়নি, না মাগুনা? মেজর, তুমি কি অনুমতি দেবে যে এই বেলজিয়ানটিকে নিয়ে আমি যা খুসী করতে পারি? দেবে? বেশ। ধন্যবাদ, মেজর। মাগুনা, ভ্যান্ একেনকে এখানে নিয়ে এসো।

কিন্তু মাগুনা চলে যাবার আগে ক্যাপ্‌টেন আবার তাকে ডাকলো এবং তার কানে কানে কি যেন বললো, তারপর সবাইকে শুনিয়ে বললো—তোমার ঘড়ির ওপর নজর রেখো। ভ্যান্ একেনকে এখানে দিয়ে যাবার ঠিক সাড়ে তিন মিনিট পর তুমি আবার এখানে আসবে।

* * * *

লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে এ্যালবার্ট সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। এই যুদ্ধে জার্ম্মানদের ভাগ্য বিরূপ হয়ে উঠেছে—এই ধরণের একটা খবর শুনতে পাবার আশা এ্যালবার্ট মনে মনে পোষণ করছিল। শত্রুপক্ষের মুখচোখ বিশ্লেষণ করে এই খবরটাই সে বুঝে নিতে চেষ্টা করছিল।

ক্যাপ্‌টেন এ্যালবার্টকে বসতে অনুরোধ করলো। কর্ণেল লেভুলেৎ সরে গিয়ে চুল্লির কাছে দাঁড়ালো—যেন এসব ব্যাপারে তার কোন কৌতুহল নেই।

—আপনার প্রতি মৃত্যু-দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করব বলে আমরা স্থির করেছি। তার অর্থ এই নয় যে, আপনাকে আমরা ক্ষমা করলাম। আপনি ক্ষমার উপযুক্ত নন। আপনার প্রতি মৃত্যুদণ্ডকে কার্য্যকরী করে তুলবার কোন সার্থকতা এখন আর নেই। আপনি মুক্ত। যেদিকে খুসী আপনি চলে যেতে পারেন।

ব্যাপারটা এত অপ্রত্যাশিত যে, এ্যালবার্ট প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না এবং বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে চুপ করে বসে রইলো।

—ভ্যান্ একেন, আপনি চুপ করে বসে আছেন কেন? আমাদের আর কিছু বক্তব্য নেই। আপনি এখন যেতে পারেন, আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত।

এ্যালবার্ট আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। সবকিছু তার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছিল। মৃত্যুর দেশ হতে জীবনের প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়ে পা তুলতে তার ভয় হোলো। মৃত্যু-দণ্ডের প্রত্যাহার আদেশ তার কাছে একটা দুর্ঘটনা এবং তার মনের নিষ্ফল ও অশোভন দুঃখ-বিলাসের উপযুক্ত শাস্তি বলে মনে হোলো।

ক্যাপ্টেন তার মুখে একটা সহানুভূতির হাসি ফুটিয়ে তুললো।

—হের ভ্যান্ একেন, আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ভাগ্যের কোন দানকে আপনি অকারণে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। আমি আপনাকে কারণ বুঝিয়ে বলব। মস্কোর যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। রাশিয়ার রাজধানী অধিকৃত হয়েছে এবং রুশ সেনাবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সমগ্র ইউরোপ আজ জার্মানীর পদানত। এ'যুদ্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়েছে, সুতরাং আপনার মত শত্রুপক্ষীয় লোককে আমরা আর বিপজ্জনক বলে মনে করি না। আপনার মৃত্যু আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। আর একথাও আপনি জেনে রাখুন, বেলজিয়ামে আমরা যে নব-বিধান প্রতিষ্ঠা করব, সেখানেও আপনার কোন স্থান নেই। আপনি এখন এখান থেকে যেতে পারেন, আপনার গতিবিধির উপর আমাদের আর কোন নজর থাকবে না।

মাগুনা প্রবেশ করলো এবং ক্যাপ্টেনের হাতে একটা চিঠি দিল। ক্যাপ্টেন প্রথমে তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিল—মাগুনা ঠিক সাড়ে তিন মিনিট পর হাজির হয়েছে কিনা; তারপর সে হাতের কাগজটা পড়বার ভান করলো। চিঠিটা পড়া শেষ হবার পর ক্যাপ্টেন সেটা এ্যালবার্টের দিকে বাড়িয়ে দিল।

—আপনার প্রতি আমার আনুকূল্যের চিহ্ন স্বরূপ আপনাকে এই চিঠিখানা আমি পড়বার অনুমতি দিচ্ছি। মস্কোতে আমাদের সম্পূর্ণ জয়লাভের সংবাদ বহন করে চিঠিখানা হেডকোয়ার্টার্স থেকে এসেছে।

এ্যালবার্ট চিঠিটার শিরোনামা পড়লো—বিশেষ গোপনীয়। জেনারেল হেড্‌কোয়ার্টার্স হইতে···

ক্যাপ্‌টেন হঠাৎ তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।

—কালকের সংবাদপত্রে এই খবর আপনি পড়বেন···আপনাকে এই গোপনীয় চিঠি দেখালে হের কর্ণেল অসন্তুষ্ট হবেন···আচ্ছা ভ্যান্‌ এেকন, আপনি যেতে পারেন, আর যেন আপনাকে আমরা না দেখতে পাই।

হলঘরের অফিসারদের ভিড় কাটিয়ে এ্যালবার্ট রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

একটা রেখাহীন বিবর্ণ কুয়াশা চারদিকে স্তরে স্তরে জমে উঠেছে। কোন বৈচিত্র্য নেই, কোন আনন্দ নেই। এ্যালবার্টের মনে হোলো, সমগ্র প্রাণী-জগত সেই কুয়াশায় ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ্যালবার্টের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল।

* * *

লেতুলেৎ জিজ্ঞাসা করলো—ক্যাপ্‌টেন, আমি বুঝতে পারছি না—কেন তুমি লোকটাকে ছেড়ে দিলে ?

—কিন্তু আমি তো ওকে ছাড়িনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আদেশে মাগুনা ওকে আবার ধরে নিয়ে আসবে। সদর দরজা পার হয়ে রাস্তা পর্য্যন্ত ওকে আমি যেতে দেব। সেখানে ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুক, তারপর ওকে আবার ধরে আনা হবে। হেসো না, কর্ণেল। আর ঐ রকম সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়োনা। আমার নিজস্ব কতগুলি মনস্তাত্ত্বিক উপায় আমি কয়েকবার প্রয়োগ করেছি···আর মেজর, এসব থিওরি তোমার মাথায় ঢুকবেনা, সুতরাং তুমি ওভাবে হাত নেড়ো না। তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলবো···মন দিয়ে শোনো কর্ণেল। আমার লেখা একটা বই তুমি কি দেখেছ ? বইটার নাম—"পরীক্ষার্থীর উপর সর্ব্বমুখীন চাপ। রাইখ্‌-এর শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে অনুন্নত জাতিকে মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষা দান ও তাদের ইচ্ছাশক্তি ধ্বংস করবার বাস্তব উপায়।" বইটা অত্যন্ত কৌতুহলদ্দীপক। কিন্তু ক্ষমা করো, আমি মাগুনাকে আমার আদেশ জানিয়ে আসি।

ক্যাপটেন মাগুনাকে ডাকলো।

—ভ্যান্ একেনকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি কোরো না, তাকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখবে।...এবার যা বলছিলাম, কর্ণেল। তুমি জান, গোলামকে বা অধীনস্থ লোককে বিশেষ কোন কাজ হতে নিরস্ত করতে হলে—ভয় দেখিয়ে চাপ দেওয়া বেশ চমৎকার উপায়। কিন্তু রাইখ্-এর স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল কার্য্যকলাপের প্রতি তাদের মনে একটা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতার ভাব জাগিয়ে তুলতে হলে শুধু ভীতি প্রদর্শন যথেষ্ট নয়। জাতি হিসাবে তাদের যে সমস্ত সহজাত ও অবিস্মৃত উদ্দীপনা আছে, তার মূলে তোমাকে প্রথম আঘাত করতে হবে... আমার বইয়ে এই সমস্ত প্রণালী সংক্ষিপ্তভাবে ছক্ কেটে দেখানো হয়েছে। তাদের কল্পনাকে বিকৃত করবার জন্য ছয়টি প্রণালী আমি দিয়েছি, সহকর্ম্মীদের প্রতি অবিশ্বাস ও শক্রুতা জাগিয়ে তুলবার জন্য তিনটি প্রণালী, আর—আচ্ছা থাক্, থাক্, এই সমস্ত বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবো না।... দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রণালীতে তাদের মনে কতগুলি মিথ্যা আশা জাগিয়ে তুলতে হবে। কর্ণেল, তোমার শুনতে ভাল লাগছে তো? সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনাকে তুমি জান; সে আমার একজন উৎসাহী ছাত্র। আমার বইটা সে সব সময় কাছে কাছে রাখে এবং আমার থিওরির উপর ভিত্তি করে সে কতগুলি নতুন প্রণালী আবিষ্কার করেছে।

মেজর হেসে উঠলো।

—হের কর্ণেল, এবার সাবধান। ক্যাপটেন এইবার একটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা সুরু করবে। আমার তো ঘুম পাচ্ছে।

—মেজর, তোমার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। আর তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, যে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের মত আমিও একটু বিদ্যাভিমানী। আমার দেশ কনিংস্‌বার্গ। বিদ্যার গর্ব্ব কাণ্টেরও ছিল। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর তার একটা নীতিভ্রষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কাণ্ট-এর সাথে আমার প্রভেদ এই যে—বিজ্ঞানকে আমি ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাই। বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমি শক্রুকে নীতিগত ধ্বংস ও চরিত্রগত অধঃপতনের পথে চালিত করব।

—মেজর বোধ হয় তোমার কথা বুঝতে পারছে। কিন্তু ক্যাপটেন, তোমার এইসব কথার সাথে ভ্যান্ একেন ও বর্ত্তমান ঘটনার কোন সম্পর্ক আমি খুঁজে পাচ্ছিনা।

—অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি এটা ব্যাখ্যা করব। আচ্ছা, এই মুহূর্ত্তে আমাদের কাজ এই যে, বেলজিয়ান রেল-শ্রমিকদের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। শুধু ভীতি প্রদর্শন করে সঙ্গে সঙ্গে কোন কাজ পাওয়া যাবে না। সে সময়ও আমাদের নেই। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তাদের মনে তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি একটা অবিশ্বাস আমরা জাগিয়ে তুলতে পারি। পরস্পরের ভিতর একটা সন্দেহ ও বিবাদ সৃষ্টি করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা ও একতার ভিতর একটা ভাঙ্গন আনতে পারি। তাদের মতের কোন স্থিরতা থাকবেনা। এক দলের বিরোধিতা করে অপর এক দল স্বেচ্ছায় আমাদের হয়ে কাজ করবে। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অপর এক দল আসবে। এইভাবে আরও অনেকে আসবে।...সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে তোমাকে আমি ক্লান্ত করব না—কিন্তু আসল কথা হচ্ছে তাদের প্রভাবান্বিত করতে হবে তাদেরই একজন লোককে দিয়ে, যাকে তারা সম্মান করে ও মেনে চলে। আমরা সোজাসুজি তাদের সঙ্গে কোন কথা বলবো না। আর তুমি জান—ভ্যান্ একেন হচ্ছে একাজের সব চেয়ে উপযুক্ত লোক।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেশবাসীদের একাজে উদ্বুদ্ধ করে তুলবার কাজে ভ্যান্ একেনের মনে একটা আবেগ কি উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব? আমার বইয়ের সতের নম্বর ছকে এই বিষয়ে পরিষ্কার করে লেখা আছে। এই ছকের বাস্তব প্রয়োগ করবার কোন সুযোগ পূর্ব্বে আমি পাইনি, কিন্তু আজ এসেছে। ভ্যান্ একেনের উপর আমি প্রথম পরীক্ষা করব।

আরও পরিষ্কার করে বলি। নিম্নতর বিজিত জাতির যে সব স্বাধীন মনোবৃত্তি আছে, কোন অবস্থায় তার প্রকাশ রুদ্ধ হয় এবং তার মূল ভিত্তি হারিয়ে ফেলে? উদ্দেশ্যের প্রতি যার বিশ্বাস আছে, আত্মবিশ্বাস যে হারায়নি, তার প্রতিরোধ ক্ষীণতম করবার উপায় কি? নিজেকে আমি এই প্রশ্ন করি এবং আমার মতে ভ্যান্ একেন হচ্ছে এই নিষ্ক্রিয় ইচ্ছাশক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

আগাগোড়া ভেবে দেখ। এই হতভাগা বেলজিয়ানটা স্থির করেছিল—তার তুচ্ছ পিতৃভূমির প্রতি সে কখনও অবিশ্বাসী হবে না। তার বদ্ধমূল ধারণা, তার এই নিষ্ক্রিয় পিতৃভূমি মিত্রশক্তির সাহায্যে জার্ম্মানীর মত বিরাট ও অপরাজেয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। তুমি বলবে, এটা তার মনের একটা অর্থহীন কল্পনা। সত্যি কথা। কিন্তু এই মিথ্যা কল্পনা ও অন্ধ বিশ্বাস লোককে একাগ্র করে তোলে। এই ভ্যান্ একেন একটা কল্পিত লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে আমাদের সাথে সহযোগিতার প্রস্তাবকে উদ্ধতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমনকি, নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এই উদ্দেশ্যে সে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছে; কোথাও বিচ্যুতি ঘটেনি। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তার লক্ষ্যপথ হতে ভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু এই শেষ মুহূর্ত্তে যখন সে দেখলো, তার কাজ ফুরিয়েছে, যে উদ্দেশ্যে সে সমস্ত শক্তি একাগ্র করে তুলেছিল, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির জন্য এখন শুধু একটা নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষা,—এই অবস্থায় তার মনে হবে, তার আর কোন কিছু করবার নেই, তার সমস্ত প্রচেষ্টা শেষ হোলো। তার মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে, একটা গভীর প্রশান্তিতে তার মন ভরে উঠবে। তার মনে হবে—সে তার কর্ত্তব্যের কোন ত্রুটি করেনি। মনে মনে সে শুধু বলবে—আমার কাজ শেষ হয়েছে। তার প্রতিরোধকে দুর্ব্বল করে তুলবার এই হচ্ছে প্রথম পর্য্যায়। তারপর কি ভাবে অগ্রসর হবে? সেই কথাই আমি বলবো। এখন এই ভ্যান্ একেনের মনে একটা নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে। তার ধারণা, ঘটনার গতিপথে তার আর কোন হাত নেই। সে জানে—তার ভাগ্য তাকে স্বাভাবিক পরিণতির পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার মনে গভীর প্রশান্তি। এইবার কল্পনা করো, ভাগ্যের যে চরম প্রতিশোধকে সে মাথা পেতে নিতে চেয়েছিল, তার ভাগ্যই সেটা প্রত্যাহার করলো। তখন? লাফিয়ে পড়বার পূর্ব্বে যে সহজাত প্রবৃত্তির বশে নিজেকে সে সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত করে তুলেছিল, হঠাৎ সে দেখলো—তার আর প্রয়োজন নেই, সম্মুখের বাঁধা অপসারিত। ফলে সে তার মানসিক স্থৈর্য্য হারিয়ে ফেলবে। যে উদ্দেশ্যে সে গতিসঞ্চয় করলো, তা ব্যর্থ হবে। এই অবস্থায় যে মুহূর্ত্তে সে সঙ্কল্পচ্যুত হবে, সে আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। তার প্রতিরোধকে দুর্ব্বল

করবার এই হচ্ছে দ্বিতীয় পর্য্যায়। এখন বুঝলে, কেন আমি তাকে গুলি করবার আদেশ ফিরিয়ে নিলাম? কারণ, এই আদেশ ভ্যান্ একেনের মনে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করবে। একটা সাহসিক উদ্দেশ্যে নিজেকে সে যখন প্রস্তুত করে তুলেছিল, সেই অবস্থায় তাকে আমি বললাম, তুমি চলে যাও, তোমার মৃত্যু আমরা চাই না, তোমার মৃত্যু আমাদের কাছে অর্থহীন। এই কথার পর তার সমস্ত সঙ্কল্প ও সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিচলিত হয়ে উঠবে। এখানেই শেষ নয়। সতের নম্বর ছকে আরও ব্যবস্থা আছে। যে মিথ্যা আশা, কল্পনা ও স্বপ্নকে ভিত্তি করে তার সঙ্কল্প সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, এই সময়ে, ঠিক এই মুহূর্ত্তে সেটা আমি নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। মস্কোতে রুশ-প্রতিরোধের সাফল্যের উপর তার সমস্ত আশা নির্ভর করছে; তার এই আশার উপর আমি প্রচণ্ড আঘাত করলাম। এই হোলো তার প্রতিরোধকে দুর্ব্বল করবার তৃতীয় ও শেষ পর্য্যায়। তারপরেও আমার হিসাবে ভুল হয়নি। আমি জানতাম, যে চিঠিটা আমি তার হাতে দিলাম, সেটা যে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে লেখা—সেদিকেও তার নজর পড়বে না। কাগজটা যদি আমি তার হাত থেকে ছিনিয়ে নাও নিতাম,তবুও সে চিঠিটা পড়ে দেখতো না। কারণ, সে অবস্থা তার ছিল না। তখন সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, কোনদিকে তার খেয়াল নেই। এই কারণেই মাগুনাকে আমি আদেশ দিয়েছিলাম, যে কোন একটা চিঠি নিয়ে আসতে—তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। সতের নম্বর ছকে এই বিষয়েও লেখা আছে। তারপর? তারপর সে চলে গেল। নিঃসঙ্গ, শূন্য···

ল্যুরাদ-এর কথায় বাধা দিয়ে কর্ণেল হঠাৎ বলে উঠলো—ক্যাপ্টেন, তোমার এই দর্শন খুবই ভালো। তোমার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শয়তানের মত সূক্ষ্ম। তোমার চিন্তাধারা প্রভুর জন্য, গোলামের নয়। কিন্তু তবুও ক্যাপটেন একথা মনে রেখো—যদিও তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভ্যান্ একেন্ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু এখনও তুমি তাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারনি।

—কর্ণেল, পেরেছি কিনা, এইবার তুমি দেখতে পাবে।

—আমি তো তাই চাই, ক্যাপটেন।

উৎসাহে ক্যাপটেন দু'হাত ঘষ্‌তে লাগল; তারপর সে এ্যালবার্টকে ভিতরে আনবার আদেশ দিল।

—হের ভ্যান্‌ একেন, আমি আপনার জন্য এবং আপনার প্রিয়জনের জন্য দুঃখ বোধ করছি। সেই হতভাগ্য স্ত্রীলোকদুটি তো কোন দোষ করেনি। তবুও আমি তাদের কথা বলবো না, আপনার সম্পর্কেই আমার কিছু বলবার আছে। আমাদের নতুন বিধানে আপনি এখনও আপনার স্থান করে নিতে পারেন। অবশ্য আমাদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্ন আর ওঠে না, সে যোগ্যতা আপনার নেই বলে প্রমাণিত হয়েছে, এবং সে সম্মানও আপনি আর ফিরে পাবেন না। কিন্তু এখনও আপনি আপনার দেশবাসীদের কিছুটা সাহায্য করতে পারেন। এখন আমাদের প্রথম প্রয়োজন—একটা নিখুঁত চলাচলের ব্যবস্থা। আর যদি রেল-শ্রমিকরা ভালভাবে কাজ না করে, তবে আপনার এই দেশকে আমরা ধ্বংস করে ফেলব ও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে এর নাম মুছে দেব। আপনার দেশের এই সব নির্ব্বোধ লোকগুলোকে জানিয়ে দিন,—যদি তারা নিজেদের মঙ্গল চায়, তবে যেন ভালভাবে কাজ করে। আপনার দেশের মঙ্গলের জন্যই এটা দরকার। অধিকৃত রাশিয়া থেকে আমরা এই দেশে শস্য, মাংস, মধু ও চামড়া আমদানী করবো। নির্ব্বোধরা একথা বোঝে না। দু'এক কথায় তাদের বুঝিয়ে বলুন—তারা যেন সুষ্ঠুভাবে দ্রুত কাজ করে। এই মুহূর্ত্তে এই কাজটি আপনি করুন। ভোরবেলা কয়েকটা ট্রেণ রাশিয়ায় পাঠাতে হবে—সেখানে নববিধান প্রতিষ্ঠা করার কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। কর্ণেল যদি অনুমতি দেন, তবে এই মুহূর্ত্তে আপনি ষ্টেশনের দিকে রওনা হতে পারেন।

এ্যালবার্ট প্রথমে বুঝতে পারলো না—এই জার্ম্মানটা তার কাছে কি চায়। তার মনে হোলো, তার শরীরে আর এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই। বিভিন্ন উত্তেজনায় তার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠলো। সে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালো আর তার হাতটা একটা পুরানো টাঙ্গিতে ঠেকলো। টাঙ্গি থেকে একটা টুং টুং শব্দ উঠলো। এ্যালবার্ট লাফিয়ে সরে এলো। তার ইচ্ছা হোলো, সে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে আর সব কিছু ভুলে যায়। কিন্তু সহসা এ্যালবার্টের মনে বিভিন্ন আবেগ একটা

প্রবল আলোড়ন তুললো, এবং পেণ্ডুলামের মত এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে দ্রুত আবর্ত্তিত হতে লাগল। একবার ইচ্ছা হোলো—সে এই খুনেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পর মুহূর্ত্তে একটা বিতৃষ্ণা ও আচ্ছন্নভাব তাকে মৃত্যুর মত চেপে ধরলো। একবার ইচ্ছা হোলো জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। পর মুহূর্ত্তে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে ইচ্ছা করলো। তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল, সমস্ত চিন্তা ও আবেগ মুছে গিয়ে একটা বিস্মৃতি সৃষ্টি করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যাপ্‌টেন যখন আবার কথা বললো, এ্যালবার্টের মনে হোলো—তার শূন্য আত্মায় জীবনের উত্তাপ ফিরে আসছে।

কিন্তু তবুও সে ক্যাপ্‌টেন-এর কথার উত্তর দিল। সে বললো, তার একমাত্র ইচ্ছা ও একমাত্র অনুরোধ, তারা যেন তার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশকে যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্যে পরিণত করে।

তার কথা শুনে ক্যাপ্‌টেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং একটা চেয়ারে ধপ্‌ করে বসে পড়লো।

ক্যাপ্‌টেনের এই বৈজ্ঞানিক উপায়কে ব্যর্থ হতে দেখে মেজর অত্যন্ত খুসী হোলো এবং চুপ করে না থাকতে পেরে হেসে উঠলো। এমনকি কর্ণেলও চাপা হাসি হাসলো এবং জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে আপন মনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললো—ক্যাপ্‌টেন, অন্য উপায়ে চেষ্টা করে দেখ। তোমার সতের নম্বর ছক্‌ তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে।

মেজরের হাসি আর কর্ণেলের ফিস্‌ফিস্‌ কথা এ্যালবার্টকে সচেতন করে তুললো। সে বুঝতে পারলো, এই আত্মম্ভরী খুনীর দল তার বিরুদ্ধে কোন অমানুষিক, জঘন্য ও নৃশংস ষড়যন্ত্র করেছে।

বিতৃষ্ণা, ক্রোধ ও ঘৃণায় সে জ্বলে উঠলো। ডান হাতের কাছে টাঙ্গিটা ঝুলছিল, সেটাকে শক্ত করে ধরে সে টেবিলের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্যাপটেন নীল হয়ে উঠলো, কর্ণেল তার রিভলবারটা চেপে ধরলো আর মেজর জানালার পর্দ্দার আড়ালে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করলো। টেবিলের দিকে ছুটে যাবার সময় এ্যালবার্টের পা লেগে সেই ওয়ালুন মিনিয়েচারটা ছিটকে বেরিয়ে

গেল আর এ্যালবার্ট হোচট্ খেয়ে পড়ে গেল। টাঙ্গিটা তার হাত থেকে খসে পড়লো।

মেজর তার কাছে ছুটে এসে পা তুলে লাথি মারতে উদ্যত হোলো।

এ্যালবার্ট উঠে দাঁড়ালো। তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে সে মেজরের দিকে তাকালো। আর মেজরের দৃষ্টিতেও সমান ঘৃণা ফুটে উঠলো।

এ্যালবার্ট মনে মনে ভাবলো, তোমরা আমার সঙ্গে খেলা স্বরু করেছ, আমিও তার উত্তর দিতে জানি।

কিন্তু একথা যখন সে ভাবছিল, সেই মুহূর্ত্তে তার মুখ থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল—আচ্ছা বেশ, আমাকে কি করতে হবে?

ক্যাপ্টেন উত্তর দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু মেজর চীৎকার করে উঠলো—না! না! ওটাকে শেষ করে ফেল। বদ্মাস্টাকে এখুনি গুলি করো।

কিন্তু ক্যাপ্টেন তখন এই ভেবে খুসী হয়ে উঠেছিল যে, তার সতের নম্বর ছকের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। কর্ণেলকে একপাশে ডেকে নিয়ে সে অনুরোধ জানালো—যেন তাকে তার এই পরীক্ষা-কার্য্যের সুযোগ শেষ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। কর্ণেল সম্মতিসূচক হাত নাড়লো।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলো—আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, সব আপনি করবেন তো?

কি কি প্রয়োজন, এ্যালবার্ট সেটা জানতে চাইলো। ক্যাপ্টেন তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল। তার কথা শুনতে শুনতে এ্যালবার্টের মনে হোলো—একবার যদি সে তার দেশের এইসব রেল-শ্রমিকদের ভিতর দাঁড়াতে পারে, তবে সে একটা কিছু মীমাংসা করতে পারবে।

সে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করলো—আমার বৌদি ও পিসীমাকে নিয়ে আপনারা কি করতে চান?

—যদি রেল-শ্রমিকদের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ বন্ধ না হয়, তবে তাদের আমরা জামিন হিসাবে গ্রহণ করবো। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যাদের আমরা জামিন হিসাবে গ্রহণ করি, তাদের কি অবস্থা হয়?

—আর যদি আমি রেল-শ্রমিকদের বুঝিয়ে বলি ?……

—হের ভ্যান্ একেন, আমরা যথেষ্ট আলোচনা করেছি। আপনাকে আমার আর কিছু বলবার নেই। যদি আপনি মধ্যস্থ হয়ে কারও পক্ষে কিছু প্রার্থনা করতে চান, আমার কাছে না এসে হের কর্ণেলের সঙ্গে কথা বলুন।

—যদি আমার আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তবে আমি যেতে রাজী আছি।

—আমি আপনাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, হের ভ্যান্ একেন। কর্ণেলকে জিজ্ঞাসা করুন।

কিন্তু কর্ণেল লেতুলেৎ কোন কথা বললো না। সে অপেক্ষা করতে লাগল। এ্যালবার্ট তার স্বীকৃতি ও অনুরোধ আরও দু'বার জানালো। অবশেষে কর্ণেল জানালার দিক থেকে ঘুরে না দাঁড়িয়ে অনিচ্ছার সুরে জড়িয়ে জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তোমার মত কি, ক্যাপটেন ?

—হের কর্ণেল, আমার মনে হয়, ভ্যান একেনের এই অনুরোধকে আমাদের মর্য্যাদা দেওয়া উচিত এবং তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত।

—আচ্ছা বেশ, তুমি কি করতে চাও, ক্যাপটেন ?

—হের কর্ণেল, আমার মতে, ভ্যান্ একেন রেলষ্টেশন হতে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক দুটির ঘরে পাহারা মোতায়েন করা হোক…কোন লোককে যেন তাদের কাছে যেতে না দেওয়া হয়,—অত্যন্ত কঠোর ভাবে এই আদেশ দেওয়া হোক। তোমার অনুমতি পেলে আমি নিজে সেখানে যাব এবং এই আদেশ যাতে যথাযথ পালন করা হয়—সেদিকে দৃষ্টি রাখবো।

এই কথা শুনে মেজর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো—তুমি কেন ওখানে থাকতে চাও ?

—মেজর, আমার কথা শেষ করতে দাও…আমি বলছিলাম—ভ্যান একেন ফিরে এলে পর তার সঙ্গে একসাথে স্ত্রীলোক দু'টিকেও মুক্তি দেওয়া হবে।

কর্ণেল বললো—মঞ্জুর।

—আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন, ভ্যান্ একেন ?

—হ্যাঁ, ক্যাপ্‌টেন।

কর্ণেল তার সঙ্গে রেলওয়ে ইয়ার্ডে যাবার জন্য মেজরকে আমন্ত্রণ করলো এবং এ্যালবার্টকে সঙ্গে নিতে বললো।

কথাটা বলে কর্ণেল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যে প্রহরীটি হলঘরে অপেক্ষা করছিল, সেও তার সঙ্গে চলে গেল।

মেজর ছিল ভোজনপ্রিয় ও পেটুক। তাদের রাত্রের আহার ফরমাস্ করবার জন্য সে কর্ণেলের অনুমতি চাইলো, বললো—এখানকার লোকেরা ভারি সুন্দর খাবার তৈরী করে। কি খেতে চাও বলো? একটা জিনিষ আমরা সবাই পছন্দ করি। কাঁচা মাংস পিষে তার সাথে নুন লঙ্কা মিশিয়ে চাট্‌নির সাথে দেওয়া হয়। এই খাবারটা আজ তৈরী করতে বলবো। ঝিনুকের মত দেখতে আটার তৈরী একরকম খাবার খেয়েছ বোধ হয়? এই খাবারের কথাও বলবো। এই খাবারের একটা বেলজিয়ান নাম আছে, আমি সেই নাম পালটে দিয়েছি। এ'ছাড়া মেটলি ইত্যাদি জিনিষের নানারকম রান্না আছে। সব তোমাকে খাওয়াব। আয়োচিম্ এবেণ্ট নামে একটা বেলজিয়ানকে একটা বিশেষ বিভাগের কর্ত্তৃত্ব দিয়ে আমি স্থানীয় কসাইখানায় নিয়োগ করেছি। মাংস তৈরী বিষয়ে লোকটা ওস্তাদ। তাছাড়া জার্ম্মানদের প্রতি ও অত্যন্ত অনুগত। ও মাঝে মাঝে আমাকে মুরগীর কাঁচা রক্ত খেতে দেয়। এখানকার লোকেরা খায়। কিন্তু আমার খেতে সাহস হয় না।

কর্ণেল রাত্রির আহার তৈরী করবার অনুমতি দিল। তারপর সে যখন মোটরে উঠছিল, তখন ক্যাপ্‌টেনকে একপাশে ডেকে এনে মেজর বললো—ক্যাপটেন, আমার নামে এসব বাজে গল্প কোন্ পাজীটা তৈরী করেছে বলতে পারো? শত্রুকে আমি দয়া করি, এসব কথা কে রটিয়েছে? এ সমস্ত মিথ্যা গুজবের ফলে এখন আমাকে পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে যেতে হচ্ছে।

কথা বলতে বলতে মেজর ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো—কেন? আমার নামে এসব কথা উঠলো কেন? আমি কেন? তোমার নামে কেন হোলো না? তোমাকে বলতে হবে, আমার পিছনে কে লেগেছে?

—মেজর, তুমি হচ্ছ প্রকৃত যোদ্ধা। আমার মনে হয়, তুমি নিজেই এটা চেয়েছিলে। বোধ হয়, তুমি নিজেই কোন সময়ে এজন্য আবেদন করেছিলে।

কর্ণেল বুঝতে পারলো, মেজর তাকে সোজাসুজি প্রকাশ্য বিদ্রূপ করলো। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সে তার হাতের বেতটা তুললো।

—ক্যাপ্‌টেন্, চালাকি করতে চেষ্টা কোরো না। আমাদের ভিতর একটা দেনাপাওনা রইলো। সৈনিকের মত তার নিষ্পত্তি করতে হবে…বুঝেছ?…চূড়ান্ত নিষ্পত্তি!

ক্যাপটেন্ কোন কথা বললো না। কর্ণেলের গাড়ীর দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সে চীৎকার করে বললো—কর্ণেল, যাই হোক, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার মতের নশ্বর চক্ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

* * *

কর্ণেল চলে যাবার পর ক্যাপ্‌টেন ফিরে এসে এ্যালবার্টের পড়বার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসলো।

চারদিক অন্ধকার। সার্জ্জেন্ট মেজর মাগুনা গোলমালের আশঙ্কা করে আর একবার পাহারা ঘাঁটিগুলোতে ঘুরে গেল।

ফিরে আসবার সময় সে ম্যারিকের ঘরের সামনে থামলো। বেঁটে ও গোলাপী-গাল সৈনিকদুটি সেখানে পাহারা দিচ্ছিল।

মাগুনা তাদের দুজনকে বললো—শোন, আশেপাশে কোন অফিসার এখন নেই। এসময়ে আমরা খোলাখুলি কথা বলতে পারি। আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সবাইকে এবার রুশ রণক্ষেত্রে যেতে হবে। তোমরা কি বলো, তোমরা এতে খুসী তো? কিন্তু যদি তোমরা এখানে থাকতে চাও, তবে আমাকে বলো; আমি ক্যাপ্‌টেনকে এ বিষয়ে বলে দেখতে পারি। ফিলিপ, তুমি কি বলো? খোলাখুলি সত্যি কথা বলো। আমি তোমার বন্ধু। এ সব কথা আর কেউ জানতে পারবে না।

গোলাপী-গাল সৈনিকটি দাঁতে দাঁত ঘষে বললো—আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে যেতে রাজী। বেশ, ভাল কথা। আমি তো এই চাই। হাইল্ হিট্‌লার।

—বেশ, এই যদি তোমার সত্যি কথা হয়, তবে আমি মেজরকে বলবো। তার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যেতে বলবো তো?

—নিশ্চয়ই। হাইল্ হিট্‌লার।

মাগুনা বললো—আমাকেও তার সঙ্গে নিয়ে যেতে বলবো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এযুদ্ধ আমাদের শেষ করে ফেলতে হবে। এখানে আরামে দিন কাটানো চলবে না। আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, শত্রুকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে তার রক্ত পান করতে হবে······আর বার্ণার্ড, তোমার কি মত? পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে যেতে চাও?

বেঁটে সৈনিকটি এক মুহূর্ত্ত দেরী করলো না।

—হের সার্জ্জেণ্ট-মেজর, এ আমার বহু দিনের স্বপ্ন। তোমার সঙ্গে আমি সর্ব্বত্র যেতে রাজী। আগুনে, জঙ্গলে, কোথাও ভয় পাব না। যেখানে তুমি যাবে, সেখানে আমিও যাব। হাইল্ হিটলার

—তোমাদের কথা শুনে আমি খুব খুসী হলাম। আজ রাত্রে এসব ঘর ইচ্ছা করলে ঘুরে দেখতে পার। যা কিছু তোমাদের পছন্দ হয়, আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমাদের বৌয়ের জন্য আমি এক একটা প্যাকেট্ দেব।

এই সময়ে ক্যাপ্‌টেন তার ঘরের দরজা খুলে মাগুনাকে ডাকলো। মাগুনা চীৎকার করে উত্তর দিল এবং ছুটে ক্যাপ্‌টেনের ঘরের দিকে চলে গেল।

তার দিকে তাকিয়ে বেঁটে সৈনিকটি চোখ টিপ্‌লো।

—কি ধড়িবাজ লোক, আর কি ভাবে মিথ্যা কথা বলে। আমি বলছি, ও নিজে কোথাও যাবে না। ক্যাপ্‌টেন ওকে যেতে দেবে না। এই লোকদুটো জোঁকের মত তোমার সমস্ত রক্ত শুষে নেবে। আর ফিলিপ, তুমি একটি গাধা, তোমার কথা শুনে মনে হোলো, সত্যিই তুমি পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে যেতে চাও।

—ঠিক, তাই আমি চাই। বার্ণার্ড, আমি চাষার ছেলে। আমার পিতা গত মহাযুদ্ধে পশ্চিম দিকে এই সব দেশেই যুদ্ধ করেছিলেন। লোকে বলে, এইসব পশ্চিম দেশে কারও কোন ভাল হয় না। আর এই লোকগুলো বড় শত্রুতা করতে পারে।

বেঁটে সৈনিকটি হেসে উঠলো।

—আর তুমি কি মনে করো, রাশিয়ানরা তোমার সঙ্গে শত্রুতা করবে না? হায় হায়! আমার ভাই স্মোলেন্স্ক থেকে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল······

গোলাপী-গাল সৈনিকটি বাধা দিয়ে বললো—চুপ, চুপ, ওরা শুনতে পাবে······ আমার ভয় হচ্ছে······

—ভয় হচ্ছে?

দুজনের মনেই ভয় এলো। কোন কথা না বলে দুজনে আতঙ্কিতভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

গোলাপী-গাল সৈনিকটি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো—এ বাড়ীতে ভাল ভাল জিনিষ আছে।

বেঁটে সৈনিকটি বললো—কিন্তু চাষার বাড়ীতে মানায়, এমন কিছু নেই।

গোলাপী-গাল সৈনিকটি তার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো, তারপর ভয় পেয়ে চুপ করে রইলো।

ঘরের ভিতর ঢুকে মাগুনা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেন পেটের উপর তার হাতদুটো রেখে বহুক্ষণ মাগুনার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। মাগুনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে দৃষ্টি সহ্য করলো। তার চোখে একটা সক্রিয় আনুগত্য ও অন্ধ বিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠলো। দেখা শেষ হলে পর ক্যাপ্টেন আস্তে আস্তে বললো—মাগুনা, আমি যাচ্ছি······আমি যাব ঐ স্ত্রীলোকটির ঘরে······বুঝতে পারছ?

—আমি বুঝেছি, হের ক্যাপ্টেন। সমস্ত প্রহরী সরিয়ে নিচ্ছি। কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।

—মাগুনা, তুমি কি রুশ রণক্ষেত্রে যেতে চাও?

—হের ক্যাপ্টেন, আপনার যা ভাল মনে হয় করুন। হাইল্ হিট্‌লার।

—মাগুনা, তোমাকে আমার সাথে এখানে রাখব।

—হের ক্যাপ্টেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—কিন্তু মাগুনা······মেজর ষ্টেশন থেকে ফিরে আসবে······শুনতে পাচ্ছ মাগুনা? মেজর এই বিষয়ে······এই স্ত্রীলোকটির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে ······মাগুনা, বুঝতে পারছ?

—বুঝেছি, হের ক্যাপ্টেন। তাহলে মাগুনা উত্তর দেবে—হের মেজর, কোন বিশৃঙ্খলা হয়নি। হের মেজর, স্ত্রীলোকটির কাছে কোন লোককে যেতে দেওয়া হয়নি। হের মেজর, হের মেজরের সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে।

—বেশ, মাগুনা, তুমি এখন যেতে পার······আর সৈনিকদুটি? ওরাও কি পূর্ব্বদিকে যেতে চায়?

—হের ক্যাপ্টেন, সব সৈনিকরা মিথ্যা কথা বলে। আপনি ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, ওরা যেতে রাজী হবে। কিন্তু ওরা বড় বাধ্য, হের ক্যাপটেন।

—মাগুনা, তুমি দেখছি ওদের প্রতি বন্ধু-মনোভাবাপন্ন।

—সত্যি কথা, হের ক্যাপ্টেন।

—আমাদের ফুরারের সেনাবাহিনীর মূলমন্ত্র হচ্ছে—পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব। কথাটা নিজে মনে রেখ এবং ওদের দু'জনকে বুঝিয়ে বোলো।

* * *

ম্যারিকের ঘরের দিকে যাবার পথে ক্যাপ্টেন ইচ্ছা করে বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেল। বাইরে সে স্থির ও শান্ত—কিন্তু মনে মনে সে আসন্ন ঘটনার অনিশ্চয়তার কথা ভেবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কোন শব্দ না করে সে ম্যারিকের ঘরের ভিতর ঢুকলো। ঘরের ভিতর অন্ধকার। ম্যারিক বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। পায়ের শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলো—কে? লুসা?

ক্যাপ্টেন কোন উত্তর দিল না। ম্যারিকও তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো না। ক্যাপ্টেন বিছানার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

একটা অবচেতন সচেতনতা ম্যারিককে সহসা সজাগ করে তুললো। সে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলো—হের ক্যাপ্টেন, এখানে তুমি কি চাও?

হ্যাঁ, এইবার সে চিনতে পেরেছে। এই লোকটিই একদিন তার কৌমার্য্যকে কলঙ্কিত করেছিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হোলো—এই দীর্ঘ কয়েকটি বছর সে যে দুর্ব্বার ক্রোধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠেছে, সব কিছু এই লোকটির উপর আজ নিঃশেষ করে দেবে। কিন্তু তার গর্ব্ব তাকে নিরস্ত করলো। সে কোন কথা বললো না।

ক্যাপ্টেনও তাকে চিনতে পারলো না। সে তখন কামনায় অন্ধ হয়ে উঠেছিল। তার মনে প্রথম যে ধারণা হয়েছিল যে, ঐ দুটি চোখকে সে আর কোথাও দেখেছে, সেকথাও আর তার মনে রইলো না।

ক্যাপ্টেন বোকার মত হাসলো, তারপর ম্যারিকের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলো।

—তুমি আমার কাছে কি চাও? ম্যারিক চীৎকার করে উঠলো। ক্যাপ্টেন তার দিকে আর এক পা এগিয়ে গেল। ম্যারিক বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

—শোন, যদি তুমি মানুষ বলে পরিচয় দিয়ে থাকো, বিবেক বলে কোন কিছু যদি তোমার থাকে, ঈশ্বরকে যদি তুমি মানো, তবে আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে তুমি স্পর্শ কোরো না! আমার জীবনে একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে।

ক্যাপ্টেন কোন কথা শুনলো না। সে তার আরও কাছে এগিয়ে এলো।

—আমাদের কথা কেউ শুনতে পাবে না। এই ঘটনা কেউ জানতে পারবে না।

ম্যারিক জানালার দিকে ছুটে গেল। জানালা বন্ধ। তখন সে ঘুরে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

—এখান থেকে দূর হয়ে যাও। তোমাকে আমি ভয় করি না। বদ্‌মাস্, পাজী, তোমাকে আমি ভয় করি না।

ক্যাপ্টেন তার দিকে ছুটে গেল।

পাশের ঘরে লুসা তখন একটি মার্ব্বেল ক্রশের সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছিল। এই ক্রশের সামনে তার মা, তার দিদিমা সকলে বংশানুক্রমে এইভাবে প্রার্থনা করে এসেছে। সে স্থির হয়ে বসে ছিল। মাঝে মাঝে শুধু তার ঠোঁট নড়ছিল এবং গালের উপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ সে একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার শুনতে পেল। চীৎকার শুনেই সে লাফিয়ে উঠে ছুট্‌তে স্বরু করলো। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোন খেয়াল তার রইলো না।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে ম্যারিকের ঘরে ঢুকেই লুসা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। সে দেখলো—ম্যারিকের হাতদুটো ক্যাপ্টেন ঘুরিয়ে ধরেছে এবং তার উপর বল প্রয়োগ করে তাকে আয়ত্বে আনবার চেষ্টা করছে।

—আমার পা ছুঁয়ে ক্ষমা চাও, তাহলে হয়ত তোমার উপর আমি দয়া করলেও করতে পারি। ক্যাপ্টেন এই কথাগুলো বিড়বিড় করে বারবার উচ্চারণ করছিল।

ম্যারিক আর্ত্তনাদ করে উঠলো। ক্যাপ্টেন হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরলো। হঠাৎ ম্যারিক দাঁত দিয়ে ক্যাপ্টেনের একটা আঙ্গুল চেপে ধরলো—তারপর তার শরীরের সমস্ত শক্তি সে তার দাঁতের উপর প্রয়োগ করলো।

ক্যাপ্টেন যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠে লাফিয়ে সরে এলো। তারপর সে ম্যারিকের গলা টিপে ধরলো। হয়ত তার আশা ছিল ম্যারিক এর পরেও তার কাছে ধরা দেবে—হয়ত সে তাকে মেরে ফেলতে চায়। দুটো সম্ভাবনাই তার কাছে চমৎকার বলে মনে হোলো। কিন্তু মেজর? মেজর এই স্ত্রীলোকটিকে তার লুণ্ঠিত সম্পত্তি বলে মনে করে। যদি সে তাকে হত্যা করে, মেজর তার কি অবস্থা করবে? তার মনে এই দ্বিধা আসতেই তার আঙ্গুলগুলো শিথিল হয়ে গেল। নিজেকে তার দুর্ব্বল বলে মনে হোলো এবং ভয়ে সে কেঁপে উঠলো। হঠাৎ সে একটা কিছুর উপস্থিতি অনুভব করলো—কে যেন ঘরের ভিতর ঢুকেছে আর ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই মেজর—এই চিন্তাটা তার মাথায় বিদ্যুতের মত খেলে গেল। মেজর নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে। জানোয়ারটা এখন আমাকে মেরে ফেলবে। ক্যাপ্টেন পিছনদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু সাহস হোলো না।

কোন দিকে না তাকিয়ে ক্যাপ্টেন ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। একবার তাকিয়েও দেখলো না—কে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

বারান্দায় পৌঁছে যখন তার মন থেকে ভয় কেটে গেল, তখন সে বুঝতে পারলো—লোকটা মেজর নয়। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে যেতে চাইলো। কিন্তু তার মন থেকে ভয়ের ভাব একেবারে কাটলো না। ভয়ে সে কেঁপে উঠলো। তার কড়ে আঙ্গুল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

ফিরবার পথে সে রুমাল দিয়ে তার আঙ্গুলটা জড়ালো। কিন্তু তবুও চুইয়ে চুইয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত মেঝের উপর পড়লো। ম্যারিকের ঘর থেকে এ্যালবার্টের পড়বার ঘর পর্য্যন্ত পথটুকু রক্ত দিয়ে চিহ্নিত হয়ে গেল।

ক্যাপ্‌টেন তার ঘরে অদৃশ্য হবার পর-মুহূর্তে মাগুনা আবার বেঁটে বার্ণার্ড ও গোলাপী-গাল ফিলিপকে ম্যারিকের ঘরের সামনে পাহারায় মোতায়েন করলো।

মেঝের উপর রক্তের ফোঁটা দেখে বার্ণার্ড হেসে উঠলো। তার হাসি শুনে মাগুনা ধম্‌কে উঠলো, কিন্তু তার হাসি থামলো না। আর ফিলিপ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বুট দিয়ে ঘষে ঘষে রক্তের দাগ উঠিয়ে ফেলতে চেষ্টা করলো।

ঘরে ঢুকে ক্যাপ্‌টেন তাড়াতাড়ি তার ব্যাগ খুললো এবং আয়োডিন্‌, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি সংগ্রহ করে তার হাতে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে চেষ্টা করলো। বাঁ হাত দিয়ে সে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিল সেই অনভ্যস্ত হাতের ধাক্কায় হঠাৎ তার ব্যাগ থেকে তার বুরুস্‌, আয়না, একটা কার্ডবোর্ডের খামের ভিতর দুখানা ফটোগ্রাফ্‌ এবং কমলা রংয়ের রিবন্‌ দিয়ে বাঁধা একটা চামড়ার ব্যাগ মাটিতে পড়ে গেল। জিনিষগুলি সে আবার ব্যাগের ভিতর রাখলো। তারপর সে সেই কার্ডবোর্ডের খামটা তার ডানহাতের কনুই দিয়ে চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তার স্ত্রী ও অষ্টাদশী মেয়ের ফটো দুখানা টেনে বার করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে সে তার হাত সরিয়ে নিল, দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে কয়েকবার মাথা নাড়লো, তারপর সেই কার্ডবোর্ডের খামটা আবার ব্যাগের ভিতর রেখে দিল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে সে চামড়ার ব্যাগের রিবনের বাঁধনটা খুললো এবং তার ভিতর হতে তার মেয়ের মাথার একগোছা সোনালী চুল বার করে সেদিকে তাকিয়ে রইলো এবং সস্নেহে সেই চুলের উপর তার ঠোঁট স্পর্শ করলো। চুলের গোছাটা ব্যাগ থেকে বার করবার পর সে তার ডান হাতটা পিছনদিকে লুকিয়ে ফেলেছিল—যেন সেই কলঙ্কিত হাত তার মেয়ের চুলের কাছে দৃষ্টিগোচর না হয়।

ডেস্কের সামনে বসে সে তার জামার বোতাম খুললো এবং ডেস্কের উপর রক্ষিত সেণ্ট জাষ্টিনের গীর্জ্জার একটি মডেলের উপর হাতের টোকা দিতে লাগল। তারপর ডায়েরী ও কলম বার করে লিখল—আমি বহুকাল ধরে যে চেষ্টা করছিলাম, ওই নির্ব্বোধ শিশুটার ভাগ্যে অবশেষে তাই ঘটলো। অবশেষে হেড কোয়ার্টার্স আমার সমস্ত সংবাদ ও সুপারিশকে মর্য্যাদা দিয়েছে। তারা তাকে "পরিশোধনের

জন্য” পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করছে। ওখানেই এই কুকুরটার কুকুরের মত মৃত্যু হোক। নীস্ জারাথুস্ত্রা বলেন…

*　　　*　　　*

সেই রাত্রে কর্ণেল লেতুলেৎ এবং মেজর যখন রেল-ষ্টেশন ও মেরামতী কারখানায় হাজির হোলো, তখন এইসব জার্ম্মান অফিসারদের উপস্থিতি শ্রমিক মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো।

উচ্চতম রেল-কর্ত্তৃপক্ষের জরুরী আদেশ—রেল-কামরা ও রেল-ইঞ্জিনগুলি পরিদর্শন ও মেরামত করতে হবে। কিন্তু ভোরবেলায় পাঠানো এই আদেশ পেতে কেন জানি অকারণ বিলম্ব ঘটেছে। এখন পর্য্যন্ত কোন কাজ সুরু করা সম্ভব হয়নি। কাজের ভিতর প্রতি পদে বাঁধা আসতে লাগল। জার্ম্মানরা সেই সব বাঁধা দূর করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। বারবার তাদের একই বাঁধার সম্মুখীন হতে হোলো।

এ্যালবার্ট ভ্যান্ একেন জার্ম্মানদের সঙ্গে এসেছে, এই খবরটা দল থেকে দলে ছড়িয়ে পড়লো। জার্ম্মানদের সঙ্গে তারা যখন এ্যালবার্টকে সত্যি সত্যি দেখতে পেল, তখনও কয়েকজন সেটা বিশ্বাস করতে পারলো না। এমন কি তাদের এই ধারণা হোলো, জার্ম্মানরা কোন লোককে এ্যালবার্ট ভ্যান্ একেনের মত সাজিয়ে নিয়ে এসেছে।

বৃদ্ধ ম্যারোনিয়ারের কাজ, রেলের কামরাগুলি জোড়া লাগানো। সে এ্যালবার্টের মৃত পিতার বন্ধু এবং ছেলেবেলায় এ্যালবার্টকে সে কাঁধে করে ঘুরে বেড়াতো। সে অর্থপূর্ণভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললো—ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এ্যালবার্টের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ কি? আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সে আমার গা ঘেঁষে চলে গেল। আমার দিকে সে ফিরে তাকালো পর্য্যন্ত, কিন্তু আমাকে চিনতে পারলো না। তার দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই। এমন একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটেছে, যা আমরা জানি না।

ইঞ্জিন ড্রাইভার ক্রকার একটা শপথ-বাণী উচ্চারণ করে বললো—ও নিজের গায়ের চামড়া বাঁচাতে চায়।

ম্যারোনিয়ার উত্তেজিত হয়ে উঠলো—মিথ্যা কথা, ভ্যান্ একেন বংশ মরতে ভয় পায় না।

ঠিক সেই সময় এ্যালবার্ট সেই দলটির কাছে এসে দাঁড়ালো। সে কথা বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কোন ভাষা খুঁজে পেল না।

ম্যারোনিয়ার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এখানে কেন? আর—আর এইসব সঙ্গী তোমার জুটলো কি করে?

বৃদ্ধ লোকটির প্রশ্ন শুনে এ্যালবার্টের দৃষ্টি খুলে গেল। সে বুঝতে পারলো, জার্ম্মানদের চোখে ধুলো দেবার যে সুযোগ সে খুঁজছিল, জার্ম্মানদের সাথে শুধুমাত্র তার উপস্থিতির ফলে সেই সুযোগ সে হারিয়েছে। এমন এক স্থানে সে আজ দেশবাসীর কাছে দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, তাকে তারা অবিশ্বাসী ও ভণ্ড ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না, এবং তার প্রতি চিরকাল তাদের সন্দেহ থাকবে।

তার মনে আর একটি দুশ্চিন্তা এলো—কি করে সে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে? এই সমর্থনের যুক্তি খুঁজতে গিয়ে সে বৃদ্ধ লোকটিকে তার প্রশ্নের উত্তরে বললো—প্রিয় বন্ধুগণ, জার্ম্মানবাহিনা মস্কো অধিকার করেছে। জার্ম্মানরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

বৃদ্ধ লোকটির চোখে জল এলো।

—আমি এই ভয়ই করছিলাম। কাল সারারাত আমার বুক ধড়ফড় করেছে। তখনই বুঝেছিলাম, একটা কিছু ঘটেছে।

এ্যালবার্ট বৃদ্ধ লোকটিকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পিছন দিকে তাকিয়ে সে দেখলো—লেতুলেৎ এবং মেজর তার দিকে আসছে।

আর কিছুক্ষণ পরে এই জার্ম্মান অফিসারদের সঙ্গে দল থেকে দলে ঘুরে ঘুরে সে প্রায় যন্ত্রের মত আউড়ে চললো—বেলজিয়ামের নামে, দেশের নামে···জার্ম্মানদের অসন্তোষের সৃষ্টি কোরো না···মস্কো অধিকৃত···

* * *

রাত্রির অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠলো। সমুদ্রের দিক থেকে কতগুলি ভারী মেঘ বাতাসে ভর ক'রে ভেসে এলো। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে গুঁড়ো গুঁড়ো

বৃষ্টির কণা একটা কালো ও ভারী পর্দার মত ঝুলে রইলো। আর বাতাসের ধাক্কায় সেই পর্দা দুলে দুলে উঠলো।

ভূগর্ভস্থিত কক্ষ হতে ম্যাথু বাইরে বেরিয়ে এলো। চারদিক একটা নিশ্ছিদ্র কুয়াশার আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে। দু'পা দূরে কোন বস্তুকে চেনা যায় না। সেই কুয়াশার উপর আলোর কোন প্রতিফলন রইলো না, চলমান ছায়াগুলি সেই কুয়াশার ভিতর হারিয়ে গেল।

ম্যাথু বুঝতে পারলো, চারদিকে কড়া পাহাড়া রয়েছে। সে একজন পাহারা-ওয়ালার সামনে পড়ে গেল, কিন্তু একপাশে সরে দাঁড়াতেই কুয়াশার ভিতর সে হারিয়ে গেল। পাহারাওলাটা তার পায়ের শব্দও শুনতে পেল না। কুয়াশা এত ঘন যে, শব্দ পর্য্যন্ত তার ভিতর ডুবে গেল।

ম্যাথু তার সব চেয়ে প্রিয় ও বিশ্বাসী বন্ধু, সহরের কসাইখানার 'ফোরম্যান্', আয়োচিম্ এবেন্টের বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিল।

গত যুদ্ধে আয়োচিম্ একশো সত্তর বার বেলজিয়ান-ডাচ সীমান্ত গোপনে অতিক্রম করেছিল। ম্যাথু ও তার সাহায্যে চারশো জন যুবক হল্যাণ্ড পার হয়ে ইংলণ্ড হয়ে বেলজিয়ান বাহিনীতে যোগ দিতে পেরেছিল।

আয়োচিম্ এবেন্ট একজন অভিজ্ঞ ষড়যন্ত্রকারী ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন উৎসাহী লোক। যে কোন বিষয়ে একটা দ্রুত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে সক্ষম, নির্ভীক ও একগুঁয়ে। সে মোরেসনেট সহরের অধিবাসী। ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার যুদ্ধের পর মোরেসনেট সহর ম্যাপ-অঙ্কনকারীদের অদূরদর্শিতার ফলে ফ্রান্স কিংবা জার্ম্মানী কারও অধীনে পড়লো না, এবং পঞ্চাশ বছর এই সহরের উপর কোন রাষ্ট্রের সরকারী পরিচালনা ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই সহরকে বেলজিয়ামের সাথে যুক্ত করা হোলো। জার্ম্মানদের প্রতি তার একটা ঘৃণার ভাব ছিল, যেমন লোকের থাকে ঘরের ভিতর নোংরার প্রতি বা পরগাছার প্রতি।

একটি কথা না বলে আয়োচিম্ দরজা খুলে দিল এবং ম্যাথুকে সঙ্গে করে ঘরের ভিতর এনে নিঃশব্দে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো। ম্যাথুর বিপরীত দিকে সে নিজে বসলো এবং তার রক্তাভ পেশীবহুল বাহুদুটি টেবিলের উপর প্রসারিত

করে দিল। তারপর সে তার বৃহৎ করতল উন্মুক্ত করে বাঁকানো আঙ্গুলের দ্রুত সঞ্চালনে ম্যাথুকে কথা বলবার আহ্বান জানালো। ম্যাথুর মত সে নিজেও অল্পভাষী। তার নীলাভ-লাল মুখে কখনও কোন রেখা ফুটে উঠতো না। মনে হোতো সেখানে কোন ভাব নেই, কোন উত্তেজনা নেই। এমন কি তার উজ্জ্বল ও নীল চোখ দুটি পর্য্যন্ত স্থির ও ভাষাহীন। একটি মাত্র তার মুদ্রাদোষ ছিল—ঘন ঘন মস্তক সঞ্চালন। ঘোড়ার গলাবন্ধ যখন চেপে ধরে, তার লাগাম যখন টেনে ধরা হয়, তখন যে ভঙ্গিতে সে মাথা নাড়ে—সেইরকম। তার এই মুদ্রাদোষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা স্মৃতি। এর সৃষ্টি হয়েছিল—যেদিন তার বন্ধু ম্যাথু একটা গভীর গর্ত্তের ভিতর হতে তাকে জার্ম্মান গুলিতে আহত ও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করে তার প্রাণরক্ষা ক'রেছিল।

ম্যাথু বললো—সে আসবে।

—কে ?

—বুঝতে পারছো না ? এ্যালবার্ট আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

আয়োচিম্ খুসী হোলো এবং টেবিলের উপর জোরে একটা চাপ দিল।

ম্যাথু হাসলো। সে জানতো, এ কথা শুনলে তার বন্ধুবান্ধবরা আনন্দিত হবে। সে আশা করতো, জার্ম্মানদের সঙ্গে শেষ হিসাবনিকাশের দিন আর বেশী দূরে নয়। তার মত যারা জার্ম্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, তারা বহুদিন হোলো ঘরবাড়ী ছেড়ে জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্য নিজেদের গোপনে প্রস্তুত করে এসেছে। বিশ্বাসঘাতকতার মনোভাব যাদের ছিল, তারা প্রথম দিকেই শত্রুর কাছে আত্মবিক্রয় করেছে। অন্য সকলে শঙ্কিত মনে যুদ্ধের গতিপথ অনুসরণ করছে এবং নিজেদের কার্য্যপন্থা স্থির করবার পূর্ব্বে অপেক্ষা করছে। দেশের সীমারেখার বাইরে যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে, তার ফলাফলের উপর তারা নির্ভর করছে।

ম্যাথু জানে, বেলজিয়ানরা প্রয়োজন হলে শান্তভাবে অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের প্রতিজ্ঞা, তাদের ঘৃণা, তাদের প্রতিশোধ-স্পৃহা নিঃশব্দে প্রতি মুহূর্ত্তে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে।

তার স্থির ধারণা ছিল, এ্যালবার্ট যখন তার সঙ্গে যোগ দেবে, লোকেরা বলবে—সময় উপস্থিত, আমাদের পেয়ালা পূর্ণ হয়ে গেছে।

আয়োচিম বললো যে, ম্যাথু ক্রশেল্স্ থেকে যেসব জাল সুপারিশ এনেছে, সেগুলি সে জার্মানদের কাছে পেশ করেছে এবং সহরের কসাইখানায় আয়োচিমের বিশেষ বিভাগে তার সহকারী হিসাবে ম্যাথুর নিয়োগ-পত্র সে কম্যাণ্ড্যাণ্টের অফিস থেকে পেয়েছে। আয়োচিমের এই সুখ্যাতি হবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, সে একমাত্র নির্ভরযোগ্য লোককেই তার সহকারী হিসাবে বেছে নেয়।

ম্যাথু এইসব কাজে একজন বিশেষজ্ঞ—এই পরিচয় দিয়ে আয়োচিম তার নাম মেজরের কাছে উপস্থিত করেছিল।

আয়োচিম ও ম্যাথু রাস্তায় বেরিয়ে এলো এবং তাদের বন্ধুবান্ধবরা যেখানে অপেক্ষা করছিল, সেইদিকে রওনা হোলো। একজন লোককে তারা আয়োচিমের ঘরে রেখে গেল। এ্যালবার্ট ও ম্যারিকের অপেক্ষায় সে থাকবে এবং তাদের সে নিয়ে যাবে।

সহরের এক প্রান্তে দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকণ্ঠে তারা হাজির হোলো। সহরের চারিদিক ঘিরে যে ট্রেঞ্চ ও দেওয়াল প্রাচীনকালে ছিল, তারই কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ তখনও সহরের সেই অংশে দাঁড়িয়ে ছিল।

তখন মধ্যরাত্রি। বাতাসের গতি পরিবর্তন হয়ে গেছে। সমুদ্রের দিক হতে না এসে এখন হাওয়া বইছে পূবদিক হতে। ফলে মেঘগুলি সমুদ্রের দিকে ভেসে চলেছে। পূবদিকের কুয়াশা পাতলা হয়ে এসেছে, আকাশ পরিষ্কার। টুক্‌রো টুক্‌রো ভাসমান মেঘের ছাপ নিয়ে গভীর নীল রংয়ের আকাশ একটা ফাঁকের সৃষ্টি করেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল তারাগুলি এক একবার ঝল্‌সে উঠছে।

—আয়োচিম, তারা দেখা যাচ্ছে এবার আকাশ পরিষ্কার হবে।

—ম্যাথু, ওটা অনেক দূরের তারা।

—তাই হবে। ওটা বোধ হয় মস্কোর তারা।

—সে তারা কি এখনও অস্ত যায়নি, ম্যাথু?

—আয়োচিম, হতাশ হয়ো না, এখনও আমরা সাহায্য পাব।

—ম্যাথু, ততদিন আমরা টিঁকে থাকব কি ?

কথা বলতে বলতে তারা কসাইখানার দালানে পৌছল। আয়োচিমের সাথে সাথে ম্যাথু দুজন প্রহরী পার হয়ে গেল। আয়োচিম তাদের সঙ্গে "প্ল্যাটডুস্" ভাষায় কথা বললো এবং রূঢ়ভাবে তাদের কথার উত্তর দিল। তার দৃষ্টিতে এতটুকু বন্ধুত্বের ভাব ছিল না। সে নিজের কদর বুঝতো, আর তাছাড়া সে ও ম্যাথু—দুজনেরই কাগজপত্র ঠিক অবস্থায় ছিল।

আয়োচিমের বিশেষ বিভাগে তার পাঁচজন সহকারী তখন কাজে ব্যস্ত ছিল। একজন জার্মান তদারকে এসে দেখলো, সবাই ঠিকমত কাজে এসেছে এবং আয়োচিম প্রত্যেককে কাজ ভাগ করে দিয়েছে। জার্মানটির দেখবার ইচ্ছা হোলো—আয়োচিমের নতুন সহকারী কেমন কাজ করে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাথুর কাজ দেখলো এবং তার অপটু হাতের কাজকে সে প্রশংসা করলো। তারপর সে খাবার ঘরে চলে গেল এবং খানিকটা বিয়ার ও কিছু স্যাণ্ডউইচ্ গলাধঃকরণ করবার চেষ্টা করলো। তাছাড়া খাবার ঘর হতে যাতায়াতের দরজার উপর নজর রাখতে কোন অসুবিধা ছিল না।

জার্মানটা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই একজনকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা হোলো—যেন তার ফিরে আসবার শব্দ পেলেই সে সঙ্কেত করতে পারে।

ম্যাথু চাইছিল, একটুও সময় নষ্ট না করে কাজ সুরু করে দেওয়া হোক। সহরের রাস্তায় রাস্তায় প্রহরীর সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল—পূর্ব্ব রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করবার জন্য সৈন্যদল একত্রিত করা হচ্ছে। তার মতে, দু'একদিনের মধ্যেই ট্রেণ চলাচল সুরু হবে। রেলের লাইন এবং ট্রেণ উড়িয়ে ফেলবার সমস্ত ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। কসাইখানার তলা দিয়ে যে নর্দ্দমার পাইপ গেছে, পরীক্ষা করে দেখা গেল—সে পাইপ ট্রেঞ্চ পার হয়ে ব্রিজের কাছে রেল লাইনের তলা পর্য্যন্ত গেছে। মাইন পাতবার সেইটাই উপযুক্ত জমি বলে বিবেচিত হোলো। কিন্তু শুধু যন্ত্রপাতির অভাবে সেই মুহূর্ত্তে কাজ সুরু করা সম্ভব হোলো না। নর্দ্দমার আবর্জ্জনা পরিষ্কার করতে আসবার আছিলায় যন্ত্রপাতি নিয়ে কসাইখানার সোফার এ্যাডাম্-এর আসবার কথা ছিল।

আয়োচিমের সহকারীরা ম্যাথুকে অনেক খবর দিল। ইয়ার্ডে ট্রেণ কি ভাবে সাজানো হচ্ছে, এইসব খবর এসে দেবার জন্য লোক ঠিক করা হয়েছে। তাছাড়া ঠিক যে স্থান হতে ট্রেণ ছাড়বে, সেখানে—সহরে পশ্চিম প্রান্ত হতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কসাইখানা পর্য্যন্ত—অর্থাৎ সহরের সীমানার সমস্ত রেল-লাইনটির উপর পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। তারা দোতালার জানালায়, ছাদে ও অন্যান্য নানা জায়গায় অপেক্ষা করবে এবং যে মুহূর্ত্তে ট্রেণ ছাড়বে কসাইখানার লোকদের ইঙ্গিতে জানাবে।

রেলের মেরামতী কারখানার মিস্ত্রী ভ্যান্ দার স্মিসেন্ জিজ্ঞাসা করলো—ছোট ভ্যান্ একেনের খবর কি? সে আসবে তো?

ম্যাথু হাসলো—বলোতো, তোমার কি মনে হয়?

—আমার ভয় হচ্ছে, যদি সে না আসে তবে আমার লোকেরা হয়ত মত পরিবর্ত্তন করতে পারে।

আয়োচিম্ একটা টুল এনে সকলের মাঝখানে রাখল এবং ঝাড়ন দিয়ে বসবার স্থানটি পরিষ্কার করে দু'পা পিছিয়ে এসে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর টেবিলটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরলো। এই ভাবেই সে নিজের খুসীভাব প্রকাশ করে।

সকলেই বুঝলো—এ্যালবার্টের জন্য টুলটা ঠিক করে রাখা হোলো।

ওয়ালুন্ মিস্ত্রী লেসানফাঁ লোকটির সব সময়েই হাসিখুসী ভাব ও বেশ আমুদে। সে একটা পুরানো যুদ্ধের গান গেয়ে উঠলো—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল ভাই।

আয়োচিমের সহকারীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো, সব কিছু ঠিকমত চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রপাতি নিয়ে এ্যাডাম্ হাজির হোলো।

ভিতরে ঢুকবার সময় ম্যাথুর সামনে সে থম্‌কে দাঁড়ালো এবং সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকালো। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিষণ্ণভাবে সে মাথা নাড়লো।

ম্যাথু হাসলো। সে জানতো—এ্যাডাম সোজাসুজি কোন কথা বলে না এবং সবকিছু নিয়ে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে। যেখানে কোন রহস্য নেই, তা নিয়েও সে একটা রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে।

কিন্তু এ্যাডামের হাবভাব দেখে আয়োচিমের মনে সন্দেহ হোলো। বোধ হয়

অপ্রিয় কিছু একটা ঘটেছে। সে জিজ্ঞাসা করলো—এ্যাডাম্, অমনভাবে মাথা নাড়ছ কেন?

—আমাকে সোজাসুজি বলবে, কেন আমি এই এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছি? এর আর কোন প্রয়োজন নেই।

—হেঁয়ালী ছাড়।

—আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

—কে?

কথা বলবার আগে এ্যাডাম্ ম্যাথুর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে গেল। ম্যাথুর উগ্র মেজাজের সাথে সে ছেলেবেলা হতে পরিচিত। ম্যাথুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বললো—ওর ভাই, এ্যালবার্ট!

ম্যাথু তার হাতদুটো বাড়িয়ে এ্যাডামের দিকে ছুটে গেল। তার মুখচোখ প্রচণ্ড আঘাতে নীল হয়ে উঠলো। আয়োচিম তাকে বাঁধা দিতে চেষ্টা করলো, কিন্তু ম্যাথু তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে চীৎকার করে উঠলো—সরে যাও!

এ্যাডামের কলার ধরে ম্যাথু তাকে উপরে তুলে ধরলো।

—আর একটি কথা মুখ দিয়ে বার করবে তো আছাড় মেরে গুঁড়ো করে ফেলব।

এ্যাডাম কথা বলতে পারছিল না। তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তার মুখ নীল হয়ে উঠলো। সে জানে, ম্যাথুকে যদি সে বলে—আমাকে ছেড়ে দাও, তবে ম্যাথু গলা টিপে তাকে মেরে ফেলবে। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ভাঙ্গা গলায় সে বললো—আমি একবর্ণ মিথ্যা বলিনি! এ্যালবার্ট বিশ্বাসঘাতক!

ধীরে ধীরে ম্যাথু তাকে ছেড়ে দিল। তার এই ক্ষণস্থায়ী বিবেচনাহীন উত্তেজনাকে সে সংযত করলো এবং মনে মনে নানা কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু এ্যালবার্টের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তার মনে হোলো না, সে ভাবলো ম্যারিকের কথা। ম্যারিকের চিন্তা তাকে বিহ্বল করে তুললো। হঠাৎ সে তার কাজের পোষাক খুলতে সুরু করলো। কিন্তু তার আঙ্গুল এত কাঁপছিল যে, জামার বোতাম সে খুলতে পারলো না। সে চুপ করে বসে পড়লো।

সে এ্যাডামকে বললো—তুমি যা জান, সব আমাদের খুলে বল। আমাদেরও জানা দরকার। তাহলে আমরা বুঝতে পারব, আমাদের এখন কি করা উচিত।

রেলওয়ে ইয়ার্ডে সে যা দেখেছে ও শুনেছে সব এ্যাডাম খুলে বললো। আয়োচিম তার হাতদুটো সমস্ত শক্তি দিয়ে টেবিলের উপর চেপে ধরলো।

—ম্যাথু, তুমি কি অন্ধ? তুমি কি করে বলো যে, সে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?

আয়োচিমের ক্রুদ্ধ স্বর ম্যাথু খেয়াল করলো না। চিন্তিত মুখে দৃঢ় ও শান্ত স্বরে সে বললো—আয়োচিম ভয় পেয়ো না। এ্যালবার্ট যাতে কোন অনিষ্ট না করতে পারে সে ব্যবস্থা আমি করবো। কথাগুলি ম্যাথু এমনভাবে বললো যেন ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা এখানেই হয়ে গেল।

—তুমি কি করতে চাও?

—ওকে আমি খুন করবো।

এ্যাডাম্ বাঁধা দিল—সেটা কোন কাজের কথা নয়, ম্যাথু। ওতে আমাদের কোন সাহায্য হবে না। মস্কো অধিকৃত। রুশরা পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং জার্মানরা নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করেছে। এ'খবর ইতিমধ্যেই এখানে এসেছে এবং জার্মানরা তাই আমোদ আহ্লাদে মত্ত।

দেশের শত্রুর সাথে সংগ্রামে নানা পরাজয়ের ভিতর সমস্ত লোক এত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, এই দুঃসংবাদে তারা কোন উত্তেজনা প্রকাশ করলো না।

আয়োচিম বললো—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার আশা ছিল, ঘটনার গতি অন্য পথে ঘুরে যাবে।

আয়োচিমকে ম্যাথু বললো, সে যেন লেসানফাঁকে পাঠিয়ে খোঁজ নেয়—ম্যারিক আয়োচিমের ঘরে হাজির হয়েছে কিনা।

আয়োচিম তার সহকারীদের পানে তাকালো।

—হতাশ হয়োনা, ভাইসব···যদিও আমরা শূয়ারগুলির জন্য কাজ করছি, তবুও সে কাজ অন্ততঃ দেখাবার জন্যও আরও কিছুকাল আমাদের করতে হবে।···

এই কথার জন্যই সকলে যেন অপেক্ষা করছিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের

কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কেউ একটি কথা বললো না, কেউ কারও দিকে ফিরে তাকালো না। গভীর দুঃখে তারা মাথা নীচু করে রইলো।

খাবার ঘর থেকে জার্ম্মানটা এতক্ষণে ফিরে এলো এবং দরজার সামনে দাঁড়ালো। সকলকে নিঃশব্দে কাজ করতে দেখে সে সন্তুষ্ট হোলো এবং আবার খাবার ঘরে ফিরে যেতে মনস্থ করলো। কিন্তু স্থান ত্যাগ করবার পূর্ব্বে মুখ থেকে বেলজিয়ান চুরুটটা সরিয়ে নিয়ে ঘোষণা করলো—

মস্কাউ ইস্ট্ কাপুট্ গেফলেন্

কথাটা বলে সে যখন চলে গেল তখন ভ্যান্ দার স্মিসেন জিজ্ঞাসা করলো—লোকটা কি বলে গেল ?

আয়োচিম অনুবাদ করলো—মস্কো নিশ্চিতরূপে অধিকৃত।

ম্যাথু তার জায়গা ছেড়ে নীচে নেমে গেল। নীচে নর্দ্দমার পাইপের ভিতর একটি রেডিওযন্ত্র লুকানো ছিল, সেদিকে সে গেল। সে কোথায় যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে, সেকথা কেউ জিজ্ঞাসা করলো না।

সকলে আবার নিঃশব্দে কাজ করতে লাগল।

ম্যাথু অনেক দেরীতে ফিরে এলো। কিন্তু যখন সে আবার ঘরের ভিতর ঢুকলো, তার মুখচোখের পরিবর্ত্তন সকলের দৃষ্টিতে পড়লো।

বিজয়-ভঙ্গিতে ম্যাথু তার সঙ্গীদের বললো—ল্যাজারাস্, এগিয়ে চলো !

—ল্যাজারাস্ কে ? তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো ম্যাথু ?

ম্যাথু আবার বললো—ল্যাজারাস্, জেগে ওঠো !

আয়োচিম্ তার অনুমান প্রকাশ করলো—তুমি গস্পেল থেকে মুখস্ত বলছো ?

—হ্যাঁ বন্ধু, তাই। তোমাদের মৃত্যু হয়েছিল এবং কবরের ভিতর তোমরা মুখ লুকিয়েছিলে। জয়ের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ছিল না। তোমাদের এই অবিশ্বাসের ফলে মৃত্যু তোমাদের হৃদয়ে স্থান পেয়েছিল। এখন সময় হয়েছে, আবার জেগে ওঠো।

তারপর ম্যাথু তাদের বললো যে, সে এতক্ষণ মাটির তলায় গোপনে রেডিয়োর খবর শুনছিল। মস্কোর কাছে রাশিয়ানদের এক বিরাট জয়লাভের কাহিনী সে লণ্ডন বেতারে এইমাত্র শুনেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে সুরু করলো। একটি মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট না করে তারা মাইন পাতবার জন্য মাটি খুঁড়বার কাজে লেগে গেল।

কিন্তু এ্যাডাম্ আবার তার চালিয়ে ফিরে এলো। সে খবর দিল যে, ভোরবেলা ষ্টেশন হতে ট্রেণ ছা এ্যাডামের কথা শুনে মাটি খুঁড়বার মতলব তারা ছেড়ে দিল—এত কম সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু একটা সুসংবাদে তারা সকলেই তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কোন বাঁধার সামনে তারা তখন হার স্বীকার করবে না। ডানায় ভর করে তাদের আশা উড়ে চললো, নির্ভীক প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, কর্ম্মের প্রতি একটা দুঃসাহসিক প্রেরণা তাদের চঞ্চল করে তুললো।

ম্যাথু বুঝলো, বাঁকের মুখে পার হয়ে গেছে।

কারণ, এই স্বর্ণ মুহূর্ত্তে শত্রুকে আঘাত করবার সুযোগ তারা ছাড়বে কেন ?···

তারপর তারা তাদের কার্য্যপন্থা স্থির করলো। ম্যাথু তার পরিকল্পনার কথা তার বন্ধুদের কাছে খুলে বললো। সেটা হচ্ছে এই—কুড়ি থেকে ত্রিশজন লোক সহরের প্রাচীন পরিখার রেখা ধরে রেল লাইনের ধারে ধারে ঝোপের ভিতর সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারা সেখানে অপেক্ষা করবে এবং ট্রেণ আসবার খবর তাদের ইঙ্গিতে জানানো হবে। ট্রেন যখন কাছাকাছি আসবে, তখন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমস্ত দলটি নানাদিক হতে ছুটে বেরিয়ে এসে প্রহরীদের আক্রমণ করবে। প্রহরীর ব্যূহ ভেদ করে তারা লাইনের কাছে এগিয়ে আসবে এবং হাত-বোমা ছুঁড়ে ট্রেণটিকে ধ্বংস করবে।

ম্যাথুর এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কেউ একটি কথা বললো না। পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। রুশ জয়লাভে তারা দুঃসাহসে জ্বলে উঠেছে। তারা সব কিছু করতে পারে। এসময়ে যে কোন প্রতিবাদকে তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতা বলে মনে করবে।

খাবার ঘর থেকে জার্ম্মানটা যখন ফিরে এলো, তখন আয়োচিম তাকে জানালো যে, কাজ হয়ে গেছে, এখন বিশ্রামের জন্য সকলকে ছুটি দেওয়া চলে।

* * *

মস্কোতে রুশ-বিজয় সংবাদ সারা সহরে ছড়িয়ে পড়লো। গ্রীষ্মের বাতাসে গাছের পাতা যেমন ঝরে পড়ে আর বাতাসে সেই পাতা ভাসতে থাকে আর মাটি সেই পাতায় ঢেকে যায়, তেমনি এই খবর ঘরে বাইরে ভেসে বেড়াতে লাগল এবং লোকের মনে আশার সঞ্চার করলো।

সহরের লোকেরা ঘুম থেকে জেগে শুনলো—মস্কোর কাছে জার্ম্মানরা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু কেউ জানলো না, এ সংবাদ কি ভাবে এলো এবং কে আনলো।

মনে হোলো যেন সহরের এই সমস্ত উৎকণ্ঠিত লোকের ঘুম-ভাঙ্গার প্রতীক্ষায় তাদের শয্যাপার্শ্বে এই সংবাদ অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। রাতের পর রাত দুঃস্বপ্ন তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। পূর্ব্বে এক সময় ঘুম ভাঙ্গার পর তারা পরস্পরকে প্রশ্ন করতো—আমি কি বেশী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? নদীর তীরে কি কামানের শব্দ শোনা যায়নি? আমাদের মুক্তিদাতারা কি এখনও পশ্চিমদিকে উপস্থিত হয়নি?—কিন্তু দীর্ঘ প্রতিক্ষায় তারা ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। বহুদিন আর তাদের মুখে এসব প্রশ্ন শোনা যায়নি। কিন্তু অবশেষে মুক্তির বার্ত্তা এসেছে এবং সে বার্ত্তা এসেছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান হতে, দীর্ঘ পথ পার হয়ে। মুক্তির আগমনী ঘোষণা করে উষার আকাশের পূর্ব্বাচলে প্রথম তারার উদয় হয়েছে।

লোকের মুখে মুখে এ সংবাদ সারা সহরে ছড়িয়ে পড়লো এবং রেলওয়ে ইয়ার্ডেও এ সংবাদ পৌছলো। বসন্তের নদীর গতিবেগের মত সেখানে এ সংবাদ একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি করলো। সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পরস্পরের সাথে তারা কথা বললো না—তবুও পরস্পরকে তারা বুঝতে পারলো। যারা সম্পূর্ণ আগন্তুক, যাদের সাথে কোন পরিচয় নেই, একটা অর্থপূর্ণ হাসির বিনিময়ে তারাও নিকট ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

এই হাসি একটা দ্রুত-সঞ্চারী পাখীর মত পক্ষ বিস্তার করলো এবং এক একবার তীরের মত মাটির দিকে নেমে এলো আর তারপরে সোজা উপরে উঠে অসীম আকাশে মিলিয়ে গেল। জার্ম্মানরাও বাদ গেল না। জার্ম্মানদের দিকে এই পাখী গুলির মত ছুটে এলো এবং তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী ডানার আঘাতে তাদের আহত করে তুললো।

রেল-শ্রমিকদের ভিতর একটা পরিবর্ত্তন এলো। কে জানে—তাদের ভিতর কোন গোপন চুক্তি হয়নি? জার্মানদের চোখের উপর, লেতুলেৎ ও মেজরের নাকের তলায় চুক্তি করবার সুযোগ কোথায় তাদের? কিন্তু তাদের চালচলন দেখে মনে হোলো—কোন একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছে। সুরে-বাঁধা অর্কেষ্ট্রার মত তাদের সকলের জটিল প্রচেষ্টা একই উদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়ে উঠলো। সকলের মুখে মুখে সেই জয়োল্লাসের হাসি অর্কেষ্ট্রার পরিচালকের মত সুরভঙ্গ হতে দিল না। সেই হাসিতে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বুদ্ধিদীপ্ত চোখগুলি জ্বলে উঠলো এবং সকলে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। নিঃশব্দে কাজ এগিয়ে চললো। কি ভাবে চলতে হবে, এর পর কি করতে হবে, সে সম্পর্কে নির্দ্দেশ-বাণী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু আসলে কি ঘটছে, এই জয়ের হাসির বিনিময়ে একটি কথাও না উচ্চারণ করে পরস্পরের সাথে কোন চুক্তিতে তারা মিলিত হয়েছে, কোন লক্ষ্যপথে তারা হঠাৎ একসাথে এগিয়ে চলেছে—বাইরের কোন লোকের পক্ষে সেটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

লেতুলেৎ ও মেজর বুঝতে পারলো—রেলওয়ে শ্রমিকদের ভিতর একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে; সুতরাং লেতুলেৎ অসন্তুষ্ট হোলো না। রেল-কর্তৃপক্ষ তাকে আশ্বাস দিল যে, ভোরবেলার মধ্যেই ট্রেণ পাঠানো সম্ভব হবে। সে প্রস্তাব করলো যে, ভ্যান একেনদের বাড়ীতে কম্যাণ্ডান্টের অফিসে মেজর ফিরে যাক এবং গুদাম হতে রেলওয়ে ইয়ার্ডে মাল পাঠাবার বন্দোবস্ত করুক। আর ট্রেণ সাজানো শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এ্যালবার্টকে সে আটক রাখবার আদেশ দিল।

রুশদের জয়লাভের কথা এ্যালবার্টও শুনলো। কথাটা ম্যারোনিয়ার তার কানে কানে বলে গেল। কিন্তু কথা বলবার সময় বৃদ্ধটি তার ক্রোধ আর চেপে রাখতে পারলো না।

—নির্ব্বোধ, কেন তুমি ওদের হয়ে কাজ করছ? ওদের এত ভয় কেন? আর বোকার মত আমাদের কেন দলে টানতে এসেছ? ভাবতে পারো কি,

তোমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি কি বলতেন ? তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ ভ্যান একেন বংশ ছিল নির্ভীক, আর তুমি কি হয়েছ ?

বৃদ্ধ ম্যারোনিয়ারের ভর্ৎসনা এ্যালবার্ট শুনতে পেল না। সেও একটা নতুন আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো। সেও একটা হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠলো। তার হাসির ভিতর দিয়ে সকলকে সে জানাতে চাইলো, তাদের সাথে তার চিন্তা ও অনুভূতির মিল আছে।

তারপর এ্যালবার্ট লাইন ধরে এগিয়ে চললো। ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। অন্ধকারের ভিতর একটি লোক তার দিকে এগিয়ে এলো। দূর থেকে লোকটি দেখলো—যে এগিয়ে আসছে, সে জার্ম্মান নয়। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় এ্যালবার্ট দেখলো—লোকটির ঠোঁটে সেই হাসি, যে হাসির নিঃশব্দ গোপন ইঙ্গিতে তারা জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। কিন্তু লোকটি যখন আরও কাছে এগিয়ে এলো, তখন সে এ্যালবার্টকে চিনতে পারলো এবং চিনতে পেরেই তার ভয় হোলো। পরমুহূর্ত্তে তার ঠোঁট থেকে হাসির রেখা মুছে গেল।

বহু লোকের সাথে এ্যালবার্টের দেখা হোলো, কিন্তু কেউ তার হাসির উত্তরে হাসলো না। শত্রুবিজয়ে তার যে আনন্দ, কেউ তার অংশগ্রহণ করলো না।

জার্ম্মান অফিসারদের সাথে ষ্টেশনে আসবার সম্মতি দেবার সময় মনে মনে এ্যালবার্টের যে ভয় ছিল, তাই অবশেষে সত্যি হোলো। দেশবাসী তাকে একঘরে করলো।

দেশবাসীর আনন্দে যে মুহূর্ত্তে এ্যালবার্ট আন্তরিকভাবে যোগ দিতে চেষ্টা করলো, সেই মুহূর্ত্তে তারা সরে দাঁড়ালো। এ্যালবার্ট বুঝতে পারলো, এর চেয়ে গুরুতর শাস্তি আর নেই।

প্রতিটি লোক এবং প্রতিটি দলের কাছ থেকে এ্যালবার্ট শুধু ঘৃণা কুড়িয়ে বেড়ালো। এ্যালবার্ট একটা প্রচণ্ড আঘাত পেল। যারা একদিন তার অত্যন্ত আপনার জন ছিল, যাদের দৃষ্টি তার কাছে একদিন অত্যন্ত প্রিয় ছিল, আজ সে তাদের ঘৃণার পাত্র। এ্যালবার্ট অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে চাইলো এবং ছুটে ষ্টেশনের দালানের ভিতর ঢুকলো।

প্রথম শ্রেণীর বিশ্রাম ঘরের সামনে একজন মহিলা তিন বছরের ছোট একটি মেয়ের হাত ধরে একা দাঁড়িয়েছিলেন। মনে হোলো, তিনি কারও জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দূর থেকে এ্যালবার্টকে দেখে তিনি হাসলেন—সেই হাসি যা সেই রাত্রে সমস্ত বেলজিয়ানকে এক-সূত্রে বেঁধেছিল। কিন্তু যেই মুহূর্তে তিনি এ্যালবার্টকে চিনতে পারলেন, তার দৃষ্টিতে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠলো। ছোট মেয়েটিও তার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। এ্যালবার্ট মাথা নেড়ে সেই হাসির উত্তর দিল। কিন্তু এ্যালবার্ট যখন আরও কাছে এগিয়ে এলো, তখন তার দিকে একবার তাকিয়েই শিশুটি কেঁদে উঠলো এবং মা'র আঁচল শক্ত করে চেপে মুখ লুকিয়ে ফেললো। এ্যালবার্টের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হোলো। সে কি একটা বিভীষিকা? শিশুরাও কি তাকে দেখে ভয় পায়?

সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এ্যালবার্ট এই উন্মত্ত চিন্তা দূর করলো। মনে মনে সে ভাবলো—শিশুটি একটি অপরিচিত মুখ দেখেই ভয় পেয়েছে। ঠিক সেই সময় একটা আয়নায় এ্যালবার্ট নিজের মুখ দেখতে পেল। তখন সে বুঝতে পারলো, শিশুটি কেন ভয় পেয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক ও হতাশা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ তার মনে হোলো—পিছন হতে কে যেন চীৎকার করে তাকে কিছু বলছে। তার ঠিক স্পষ্ট ধারণা হোলো না—কে যেন তাকে দূর হয়ে যেতে বলছে, কে যেন তাকে শাসাচ্ছে, কে যেন তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। এ্যালবার্ট ঘুরে দাঁড়ালো। সে দেখলো, লেতুলেৎ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

জার্মান কর্ণেলটি তাকে কিছু একটা করবার আদেশ দিচ্ছে, কিন্তু এ্যালবার্ট সেটা ভালভাবে বুঝতে পারলো না। কিন্তু এ্যালবার্টের কাছে এখন সব কিছু অর্থহীন, কোন কিছুতে আসে যায় না। সে কর্কশভাবে চীৎকার করে উঠলো—দয়া করে চুপ করো। আমি তোমার চাকর নই। এভাবে চীৎকার করবার সাহস আসে কোথা থেকে তোমার?

কর্ণেল এ্যালবার্টকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিল। এ্যালবার্ট ছুটতে সুরু করলো। প্রথমে যে দরজা চোখে পড়লো সেটা দিয়ে বেরিয়ে হল ঘরের পাশের খালি ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল এবং জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো।

এ্যালবার্ট ছুটতে লাগল এবং জার্মানরা তার পিছনে তাড়া করে এলো। কিন্তু এই সমস্ত পথঘাট এ্যালবার্টের কাছে শিশুকাল হতে সুপরিচিত। অভ্যস্ত পথে অনায়াসে সে ছুটে চললো এবং তার অনুসরণকারীরা অনেক পিছনে পড়ে রইলো। ছুট্‌তে ছুট্‌তে একটি চিন্তা বারবার এ্যালবার্টকে তার ছেলেবেলার কথা মনে করিয়ে দিল। তখন সে স্কুলে পড়তো। প্রাচীন শিল্পী ও চিত্রকরদের আঁকা একখানি ছবি সে দেখেছিল। ছবিখানিতে সশিষ্য যীশু খ্রীষ্টের নৈশ-ভোজনে জুডাকে দেখানো হয়েছে। যীশুর অন্যান্য গৌরবর্ণ ও সুদর্শন শিষ্যদের মধ্যে জুডার মুখখানি কালো। শিশু বয়সে এ্যালবার্টের মনে এই কালো লোকটির প্রতি একটা আতঙ্ক ছিল। তার জানতে ইচ্ছা হোতো, কি ভাবে কেন এই লোকটি আলো হতে দূরে সরে এলো এবং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলো।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে এ্যালবার্ট নালার কাছে চলে এলো। সামনেই যে ঝোপটি—তার ভিতর দিয়ে তার বাড়ীর ভূগর্ভস্থ কক্ষে যাতায়াতের গুপ্ত পথ। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য এ্যালবার্ট তার অনুসরণকারী সৈনিকদের বন্দুকের সীমানার ভিতর এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি ছুটে এলো। দূর থেকে সৈনিকেরা দেখলো—এ্যালবার্ট মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু বুলেট্‌টা এ্যালবার্টের শরীর বিদ্ধ করতে পারলো না। সে নিজেই বুঝতে পারলো না, শব্দ শুনে কেন সে মাটিতে পড়ে গেল। সে হামাগুঁড়ি দিয়ে ঝোপের কাছে এগিয়ে এলো এবং গুপ্ত-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সৈনিকেরা ছুটে এলো, কিন্তু এ্যালবার্টের দেহ কোথাও খুঁজে পেল না। অল্প সময় খুঁজবার পর তারা স্থির করলো মৃতদেহ নীচু জমি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নালার ভিতর পড়ে গেছে। কর্ণেলের কাছে তারা সংবাদ পাঠালো—এ্যালবার্ট ভ্যান একেন নিহত।

* * *

ম্যারিক এবং লুসার ঘরের বন্ধ জানালা ভেদ করে এই গুলির শব্দ তাদের কানে পৌছলো এবং তারা দুজন চমকে উঠলো।

ক্যাপ্‌টেন সেই ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর তারা কেউ একটি কথাও বলেনি।

দুজনেই নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে ছিল। লুসা ভাবছিল—তার জীবনের আজ এই একটি দিনে যে সমস্ত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলো, তার সারা জীবনেও এত ঘটেনি। তার মনে হোলো, অভ্যস্ত জীবনের গণ্ডী লঙ্ঘন করে সে যে আজ বেরিয়ে এলো, সেটা তার পক্ষে কখনও শুভ হবে না। একটা অদৃশ্য শক্তি লুসার উপর ভর করলো। সে চীৎকার করে, ছুটোছুটি করে তার প্রতিবাদ জানাতে চাইলো। নিজেকেই নিজের কাছে অপরিচিত বলে মনে হোলো। ভয়ে লুসা কেঁপে উঠলো। তার মনে হোলো, যে অস্বাভাবিক পথে তার জীবন ঘুরে গেল তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তার আত্মার মৃত্যু ঘটছে; এই উত্তেজনা তার বহিঃপ্রকাশ।

ম্যারিকের মনে একটা উদাসীনতা। এইমাত্র যা ঘটে গেল এবং ভবিষ্যতের গর্ভে আরও যা কিছু অপেক্ষা করছে—সব কিছুরই প্রতি একটা নিস্পৃহতা। যৌবনের প্রারম্ভ হতেই তার নিশ্চিত ধারণা—তার জীবনে শুধু দুর্ভাগ্য ও নির্য্যাতন বার বার এসে দেখা দেবে। প্রথম যৌবনে যেদিন সে নির্য্যাতিত, কলঙ্কিত ও ও অসম্মানিত হোলো, সেদিন মনে মনে সে বুঝেছিল—জীবনে কোনদিন সে সুখী হবে না—তার মৃত্যু ঘটলো। সুখের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না, কোন দিন সে সুখের সন্ধান করেনি। সব সময়ে তার মনে হোতো, সুখ তুচ্ছ—উচ্চতর উৎকর্ষতর একটা কিছু পৃথিবীতে আছে। এর কোন নাম আছে কিনা, সে জানতো না। কিন্তু সে অনুভব করতো, এই পৃথিবীতেই এর অস্তিত্ব এবং এর স্থায়িত্ব সুখের চেয়ে দীর্ঘতর, সুখের চেয়েও পবিত্র, আরও উদার, আরও মহৎ—অনন্তের মত বিরাট। বোধ হয় এর নাম ন্যায়পরতা বা কর্ম্মফল—সে জানতো না। রেণীর কথা সে ভাবলো। রেণীর জন্মের প্রথম দিন হতে তার সমস্ত অতীত জীবন তার চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। পৃথিবীর আলোয় রেণী প্রথম যেদিন চোখ মেলে তাকালো, যেদিন প্রথম সে একটা বোবা চীৎকার করে উঠলো, যেদিন প্রথম সে অসহায় নিষ্পাপ হাসি হেসে উঠলো—সেই দিন হতেই ম্যারিক জানতো, রেণীকে সে হারাবে—তার দীপ্ত যৌবনকে একদিন তার ভাগ্য যেমন অতর্কিতে ও যেমন নিষ্ঠুরভাবে ছিনিয়ে নিয়েছিল, তেমনি ভাবে। ভাগ্য তার প্রতি বিরূপ। ম্যাথু যেদিন চলে গেল, সেদিন সে তার সমস্ত বিশ্বাস হারালো—যে বিশ্বাসে ভর করে নিজেকে

সে নিষ্পাপ বলে মনে করতো। নিজের নির্ব্বাচিত পুরুষের প্রতি তার যে নিঃশব্দ অবচেতন পূজা—সেটা নিঃশেষে মুছে গেল।

এখন তার একটি মাত্র কামনা আছে। পৃথিবীর এক কোণে তার জন্য ছোট্ট একটু স্থান সে সৃষ্টি করে নেবে। সেখানে রেণার স্মৃতিতে সে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করবে। তার মা, মাতামহ, তার প্র-মাতামহ এবং বিগত কয়েক শতাব্দীর সমগ্র ধর্ম্মশীলা নারীদের কাছে এই শিক্ষাই সে পেয়েছে। তারা সকলেই "মৃতের দিন"কে বিশ্বাস করতো এবং এই বিশ্বাস আপন সন্তানের ভিতর সঞ্চারিত করে যেত। একটা কথা ভেবে ম্যারিকের দুঃখ হোলো। সে জানে না—কোথায় রেণীর মৃত্যু ঘটলো, রেণীর সমাধি-স্থানকে সে কোন দিন চোখের দেখা দেখতে পাবে না।

ম্যারিক এবং লুসা পাশাপাশি বসে রইলো। ম্যারিক কাঁদছিল। সেই উষ্ণ জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করে লুসার প্রাচীন হাতের উপর ঝরে পড়লো। লুসা কেঁপে উঠলো। ঠিক সেই সময় তারা বন্দুকের গুলির শব্দ শুনলো—যে গুলির শব্দ শুনে এ্যালবার্ট মাটিতে পড়ে গেছিল। লুসা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কেন, সে নিজেই বুঝতে পারলো না। তার মনে হঠাৎ একটা নতুন আশার সঞ্চার হোলো। সেই গুলির শব্দ একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা তার কাছে বহন করে নিয়ে এলো।

দেড় বছর আগে যেদিন জার্ম্মানরা সহরে প্রথম প্রবেশ করলো, সেই দিন হতে নিস্তব্ধতা সহরের উপর ঝুলে ছিল। নিষ্ঠুর হাতে তারা সব কিছু দমন করলো। তবুও যেখানে প্রতিবাদ দেখা দিল, সেখানে তাদের বন্দুক গর্জ্জন করে উঠলো। কিন্তু সে গর্জ্জন তাদের পাথর-চাপা শান্তি-ঘরের দেওয়াল ভেদ করে বাইরে আসতে পারতো না। কিন্তু রাত্রির আকাশের তলায় আজ এই প্রথম নির্ব্বাধ শব্দের ঢেউ উঠলো। গুলির শব্দে যেন একটা সাবধান-বাণী, একটা প্রতিদ্বন্দ্বীতা, একটা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা মুখর হয়ে উঠলো। লুসা আর স্থির হয়ে থাকতে পারলো না। একটা কিছু তাকে যেন করতেই হবে। জরাগ্রস্তের মত সে ঘরের ভিতর পায়চারী করতে লাগল। হঠাৎ সে পালকের ঝাড়নটা তুলে ধুলো ঝাড়তে সুরু করলো। তারপর কি করতে চায় সে সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা না নিয়েই দ্রুতপদে ঝাড়নটা হাতে নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বার্ণার্ড ও ফিলিপ তাকে দেখলো, কিন্তু বাঁধা দিল না। মাগুনাও তাকে ক্যাপটেনের ঘরের দিকে যেতে দেখলো, কিন্তু তার হাতের ঝাড়ন দেখে আর কোন কথা বললো না—যদিও রাত্রিবেলা ঘর ঝাড়বার অস্বাভাবিকতায় সে অবাক হোলো।

কোন শব্দ না করে লুসা এ্যালবার্টের পড়বার ঘরে ঢুকলো। ক্যাপটেন ডেস্কের সামনে বসে কি যেন লিখছিল।

দরজার শব্দ হতেই ক্যাপটেন মাথা তুলে ফিরে তাকালো এবং লুসাকে দেখতে পেল। লুসার হাতের দিকে চোখ পড়তেই সে কেঁপে উঠলো—ওটা কি? অস্ত্র? ক্যাপটেন আরও ভাল করে তাকালো। লুসার হাতে একটা ঝাড়ন—সরু লম্বা একটা কাঠির মাথায় মোরগের পালক দিয়ে তৈরী। নিজের ভয় দেখে নিজের প্রতি ক্যাপটেনের করুণা হোলো। লুসা স্খলিত পদে পাগলের মত ক্যাপটেনের দিকে এগিয়ে এলো এবং চাপা গলায় বললো—আমি···আমি আগুনটা ঠিক করতে এসেছি···দরকার হলে···

ক্যাপটেন লুসার দিকে তাকালো। লুসাকে দেখে তার মনে হোলো—নির্ব্বোধ ও হাস্যকর। লুসার সাথে কোন কথা সে বললো না। ক্যাপটেনের পিঠের দিকে আগুন জ্বলছিল; সেদিকে ইঙ্গিত করে সে তার সম্মতি জানালো। লুসা নিঃশব্দে সরে এলো। মনে হোলো, মেঝের উপর তার পা পড়ছে না, সে ভেসে বেড়াচ্ছে। ক্যাপটেন ফিরে তাকালো—লুসা প্রথমে ঝাড়ন দিয়ে ঘড়িটার ধুলো পরিষ্কার করলো; তারপর হাতের ঝাড়ন রেখে আগুন উস্কিয়ে দেবার লৌহদণ্ডটি তুলে নিল এবং কয়লাগুলো খুঁচিয়ে দিল। তার দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন ভাবলো—এই দুর্ব্বলমনা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ঘৃণার পাত্র। প্রতিদিনকার অভ্যস্ত সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভিতর এই স্ত্রীলোকটি যন্ত্রের মত নির্ব্বোধ হয়ে উঠেছে। স্ত্রীলোকটি এই ঘরে এসেছে, ভালই হয়েছে। ওকে এখন এই ঘরের ভিতর বন্ধ করে রেখে আমি আবার অনায়াসে ফ্লেমিশ স্ত্রীলোকটির কাছে যেতে পারি।

এই কথা ভেবে ক্যাপটেন খুসী হোলো। তারপর তার মনে হোলো, ফ্লেমিশদের সম্পর্কে তার এই সব মন্তব্য লিখে রাখা মন্দ নয়। সে লিখলো—

বেলজিয়ানদের দেখে আমার নিষ্প্রাণ যন্ত্রের কথা মনে হয়। প্রিয়জনের একান্ত দুঃসময়েও তারা তাদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম অত্যন্ত অনুত্তেজিতভাবে সম্পন্ন করে। এটা তাদের চরিত্রের বলিষ্ঠতা নয়, নৈতিক শক্তিহীনতা। এই কারণে সমষ্টিগত-ভাবে বেলজিয়ানরা দাস-জাতি। কোন প্রতিবাদ না তুলে তারা কাজ করবে। যে কোন আদেশ···

কিন্তু ক্যাপটেন তার লেখা শেষ করতে পারলো না। লুসা তার হাতের ভারী লৌহদণ্ডটি মাথার উপর তুলে উন্মত্তের মত প্রচণ্ড শক্তিতে ক্যাপটেনের মাথার উপর আঘাত করলো। ক্যাপটেনের মুখ দিয়ে একটি শব্দ বার হোলো না, ডায়েরীর পাশে ডেস্কের উপর তার মাথাটা লুটিয়ে পড়লো।

নিঃশব্দে উড়ে আসার মত লুসা দরজার কাছে ছুটে এলো। কিন্তু দরজার হাতল সে খুঁজে পেল না। তার হাত কাঁপছিল, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, অন্ধের মত সে চারদিক হাতড়াতে লাগল। ভয় পেয়ে লুসা ঘরের আর এক কোণে ছুটে এলো। সেখানে কতগুলি চওড়া ও প্রায় ছাদ-পর্য্যন্ত-লম্বা তক্তা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে রাখা হয়েছিল—তারই ফাঁকে ছোট মেয়ের মত ক্ষিপ্রভাবে হামাগুড়ি দিয়ে লুসা ঢুকলো।

সেখানে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে হাঁটুর উপর চিবুকের ভর দিয়ে লুসা বসলো। নিজেকে এভাবে লুকিয়ে ফেলে সে শান্ত হোলো। কিন্তু তার কোন অনুভূতি রইলো না, রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তবুও এক গভীর অন্তর্দেশে—যেখানে তার সচেতনতা হারিয়ে যায় নি—শুধু ম্যারিকের অশ্রুর স্মৃতি রয়ে গেল, যে অশ্রু তার বয়োজীর্ণ হাতের উপর তরল আগুনের মত ঝরে পড়েছিল। কিন্তু এই স্মৃতিও তার কাছে ক্রমশঃ অস্পষ্ট, অস্পষ্টতর হয়ে উঠলো—যেন ক্রমশঃ দূরে সরে সরে যাচ্ছে। সহসা আর একটা চিন্তা তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল। সে যা করেছে, তা উগ্র রকমের অস্বাভাবিক, তার প্রাত্যহিক নিয়মিত জীনের গণ্ডির বাইরে, নীতি-বিরোধী। এই সচেতনতা তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললো। তার হৃদ্‌পিণ্ডের চলাচল ভয়ে বন্ধ হয়ে গেল। হাঁটু দুটো কেঁপে উঠলো—কিন্তু পা ছড়িয়ে দেবার মত স্থান সেখানে ছিল না। তার মাথাটা ঢলে পড়লো। তার মৃত্যু হোলো।

তার ভাই—এ্যালবার্ট ও ম্যাথুর পিতার আকস্মিক মৃত্যুর মত তার মৃত্যু হোলো। কিন্তু তার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল আনন্দে, আর তার মৃত্যু হোলো নরহত্যার সচেতনতা নিয়ে। কিন্তু যে ভঙ্গিতে তার মৃত্যু হোলো, তার ভিতর একটা শান্ত গাম্ভীর্য্য ছিল, যেন সে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে বিশ্রাম করছে।

*　　　*　　　*

ষ্টেশন হতে ফিরে ভ্যান্ একেনের বাড়ীতে মেজর ঢুকলো। চারদিক শান্ত। সৈনিকদুটি ম্যারিকের ঘরের সামনে পাহারা দিচ্ছে। সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনা মেজরকে জানালো, কোন গোলমাল হয়নি।

—এই বেলজিয়ান স্ত্রীলোকটির ঘরে কি কেউ ঢুকেছিল ?

—কেউ নয়, হের মেজর।

—বেলজিয়ান স্ত্রীলোকটি কি তার ঘরেই আছে ? বৃদ্ধাটি কোথায় ? আর ক্যাপটেন কোথায় ?

—বেলজিয়ান স্ত্রীলোকটি তার ঘরেই আছেন। ক্যাপটেন পড়বার ঘরে রয়েছেন। আর বৃদ্ধাটি এই কয়েক মিনিট হোলো ক্যাপটেনের ঘরে ঢুকেছে।

—কেন ? তুমি তাকে ঢুকতে দিলে কেন ?

—হের মেজর, এ সম্পর্কে কোন আদেশ তো আপনার কাছ থেকে আমি পাইনি।

—এর কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে।

সার্জ্জেণ্ট-মেজর মাগুনাকে মেজর বিশেষ পছন্দ করতো না। সে মনে করতো, এই লোকটি ক্যাপটেনের ডান-হাত এবং তার গুপ্তচর।

ঘরে ঢুকবার সময় মেজর মনে মনে ভাবলো—হতভাগা ক্যাপটেনটা নিশ্চয়ই বেলজিয়ান স্ত্রীলোকটির ঘরে ঢুকেছিল আর এই পাজী সার্জ্জেণ্ট-মেজরটা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছে।

মেজর ঠিক করলো—ক্যাপটেনের সাথে "সৈনিকের মত" একটা শেষ বোঝাপড়া করতে হবে।

দরজা খুলে মেজর দেখলো, ক্যাপটেন মাথা নীচু করে বসে আছে। মেজর

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হোলো—ও নিশ্চয়ই বেলজিয়ান স্ত্রীলোকটির ঘরে ঢুকেছিলো। আর এখন ফিরে এসে মদ টেনেছে, তারপর নেশার আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মেজর চীৎকার করে উঠলো—ক্যাপটেন!

কিন্তু ডেস্কের কাছাকাছি আসবার আগেই সে বুঝতে পারলো, ক্যাপটেন্ মৃত। বোধ হয় খুন হয়েছে। মেজর ভয় পেয়ে গেল। কি ভাবে খুন হোলো? কে খুন করলো? এক লাফে মেজর জানালার কাছ থেকে সরে এসে পরদার আড়ালে আত্মগোপন করলো। প্রতি মুহূর্ত্তে তার মনে হোলো, এইবার রাস্তার দিক হতে একটা গুলি ছুটে আসবে। পরদার আড়াল হতে বেরিয়ে আসতে তার ভয় হোলো। মেজর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, কিন্তু কোথাও কোন শব্দ হোলো না।

ক্যাপটেন্‌কে দেখে দুঃখ হোলো। বিশেষ রক্তপাত হয়নি, শুধু ডান কাঁধের ইউনিফর্ম্মের উপর খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। মেজর দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইলো, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের আশঙ্কা পা দুটোকে শক্তি-হীন করে ফেললো। রিভলভারটা বার করে সে সামনের দিকে উদ্যত করে রাখলো, তারপর অত্যন্ত সতর্কভাবে বহু কষ্টে ডেস্কের কাছে এগিয়ে এসে বেল টিপলো।

মাগুনা ঘরে ঢুকলো।

—এই ঘরটা এবং সমস্ত বাড়ীটা খানাতল্লাসী করো।

মেজর তার আশ্রয় ত্যাগ না করে এই আদেশ দিলো।

মাগুনা সৈনিকদের ডেকে আনলো। লোকজন দেখে মেজরের সাহস ফিরে এলো। সে চীৎকার করতে লাগল—

—ভাল করে খুঁজে দেখ। জানালাগুলি বন্ধ আছে তো? চুল্লীটা পরীক্ষা করে দেখ। খুনী বোধ হয় ঐ চিম্‌নির ভিতর দিয়ে ঢুকেছে। টেবিলের তলায় কেউ নেই তো?

বেঁটে বার্ণার্ড হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—এই তো সেই বুড়ী!

মেজর তার আশ্রয় থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো—বেরিয়ে আয়, ডাইনী!

ক্রোধে অন্ধ হয়ে মেজর তক্তাগুলো টেনে ফেলে দিল। বেঁটে লোকটার গায়ে সেই তক্তা লাগলো এবং সে আঘাত পেল।

—বেরিয়ে আয় ডাইনী ! নইলে তোকে খুন করবো !

মেজর তার রিভলবারের লক্ষ্য স্থির করলো। তার মনে হোলো, লুসা হাসছে।

—হের মেজর, ও মরে গেছে।

বেঁটে সৈনিকটি অতি মৃদুস্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করলো। মনে হোলো, তার মনে ভয় আছে যে, কথাগুলি লুসার কানে ঢুকলে লুসা চোখ মেলে তাকাবে।

* * *

মৃতদেহ দুটি ঘর থেকে সরিয়ে ফেলবার পর মেজর টেবিলের উপর হতে ক্যাপটেনের ডায়েরীটা তুলে নিল। ডায়েরীটা পড়ে মেজর বুঝতে পারলো, তার সন্দেহ ঠিক—ক্যাপটেন তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠিয়েছে। মনে মনে মেজর ভাবলো—জার্মানরা ডায়েরী লিখতে এত ভালবাসে কেন? এমন কি এই মৃত ক্যাপটেনের মত অপদার্থ লোকেও তার অর্থহীন চিন্তা ও অভিজ্ঞতা তার ডায়েরীতে লিখে রাখে।

মেজর ডাকলো—মাগুনা!

মাগুনা ঘরে ঢুকলো। সে ভয়ে কাঁপছিল। ক্যাপটেনের হত্যাকাণ্ডে সে বাধা দিতে পারেনি। তার উপর ভীষণ একটা শাস্তির আশঙ্কা সে করছিল।

মেজর শান্তভাবে বললো—বোসো, মাগুনা। তোমাকে আমার দরকার আছে। তুমি তোমার মৃত প্রভুকে এত সব সুন্দর সুন্দর মতলব দিতে পেরেছিলে যে, কেউ তাকে কোনদিন অনুকম্পাশীল বলে দোষ দেয়নি। এখন এই ঘটনা আমি হেডকোয়ার্টারকে জানাবো। তারা নিশ্চয়ই আমার মতামত চেয়ে পাঠাবে। আমি প্রস্তাব করবো—প্রথমতঃ, ক্যাপটেনকে সসম্মানে বীরোচিতভাবে সমাধিস্থ করা হোক ; আর কি ? দ্বিতীয়তঃ, আমরা জামিন হিসাবে লোক আটক করবো। কতজন, মাগুনা ? কুড়ি ? না, আরও বেশী। ত্রিশ ? পঞ্চাশ ? একশো ? তোমার কি মনে হয় ? মাগুনা, তুমি বুদ্ধিমান—একশোই থাকুক, কি বলো ? যে সমস্ত লোককে আমরা ইতিমধ্যে জামিন হিসাবে আটক করেছি, তাদের পঞ্চাশ জনকে তুমি এবং আমি গুলি করে মেরে ফেলবো। তোমার কি মনে হয় ? গুলি করে মেরে ফেলা ভাল নয় ? তুমি হাসছ, ক্ষুদে শয়তান ! তার মানে গুলি করে

মেরে ফেলাই ভাল। আমরা আর কি করতে পারি? সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাথায় কোন মতলব আসে না; আর এইজন্য বসে বসে মাথা ঘামানো পছন্দ করি না। সহরে এমন কোন আকর্ষণের বস্তু নেই কি—যা আমরা পুড়িয়ে ফেলতে পারি? সহরে সব চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? কে সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার পাত্র? সমস্ত ওলোট্ পালাট্ করে দিলে কেমন হয়?

মাগুনার মনে একটা পরিবর্ত্তন এলো। তাকে ঘিরে যে মেঘ ঘন হয়ে উঠেছিল, এখন সেটা সরে যাচ্ছে বলে মনে হোলো। মৃত ক্যাপ্টেনের সে যেমন ডান-হাত ছিল, এখন মেজরও তাকে সেইভাবে গ্রহণ করবে বলে তার বিশ্বাস হোলো।

—হের মেজর, আমাকে অনুমতি দিন। কতগুলো প্রস্তাবের একটা তালিকা আমি তৈরী করেছি। লোকে দিবা-স্বপ্ন দেখে, এমন কতগুলি মুহূর্ত্তে…বহুদিন ধরে আমি এই সমস্ত প্রস্তাব ভেবেছি।…দয়া করে একবার পড়ে দেখুন…প্রতি বিশেষ বিষয়ে সাতষট্টিটা শাস্তি-বিধানের উল্লেখ এই তালিকায় আছে। পুরুষ হোক, স্ত্রীলোক হোক, ধর্ম্মযাজক হোক বা প্রাচীন ব্যক্তি হোক—সকলের উপরে সমভাবে এই বিধান প্রযোজ্য। এই সহরকে আমি বিশেষভাবে জানতে চেষ্টা করেছি। বত্রিশ নম্বর হতে ছে'চল্লিশ নম্বর পর্য্যন্ত বিধানগুলো নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া আছে। এগুলো অল্পবয়স্ক শত্রু, স্কুল ও শিক্ষকদের উপর প্রযোজ্য। লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া বিধানগুলো কারখানা, দোকান এবং পারিবারিক জীবনে প্রযোজ্য। "আতঙ্ক ও ভীতির বৈচিত্র্য"—এই শিরোনামায় তালিকার একেবারে শেষদিকে কতগুলো কৌতুকপ্রদ ও মজার কৌশল বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে কতগুলো বিধান আছে যা রাস্তায় পার্কে প্রকাশ্য শাস্তি প্রয়োগের সময় ব্যবহৃত হবার উপযুক্ত। এই বিধানগুলোর একটা পৃথক তালিকা আছে—সংখ্যার বদলে অক্ষর দিয়ে তাদের ভাগ করা হয়েছে। তালিকার বিস্তৃত বিবরণ ও মন্তব্য রোমান সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত।

—বেশ ভাল কথা, মাগুনা। তুমি বুদ্ধিমান লোক। তোমার তালিকাটি আমাকে দাও।

মেজর গভীর মনোযোগ দিয়ে তালিকাটি পাঠ করলো। একবার সে মাথা নাড়লো, তারপর চেয়ারের পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে হাসলো, তারপর ভুরু কুঁচকে বসে রইলো। মনে হোলো তার সমর্থন নেই। মার্জিনের ধারে বড় বড় করে সে সে কয়েকটা চিকে কাটলো।

—মাগুনা, তোমার এই তালিকার সাতষট্টিটা বিধানের ভিতর হতে আমি আটটা বেছে নিয়েছি। এই বাছাই করবার কাজেই আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। শুধু কাজ, আর কাজ! কেন মাগুনা, আমারা তো সৈনিক। আমাদের সম্মানিত মৃত ক্যাপ্‌টেনের মত আমি ব্যুরোক্র্যাট্‌ নই। এই জন্যই হেডকোয়ার্টার্সে ডেস্কের পিছনের আসন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রকে আমি অনেক বেশী পছন্দ করি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সব কিছু আমার কাছে আরও সহজ বলে মনে হয়। মাগুনা, মাথা খাটিয়ে কাজ করা রীতিমত শক্ত আর তার মত বোকামী আর কিছু নেই। সুতরাং তোমার এই তালিকাটি আমি আমার পকেটেই রেখে দিলাম। এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মাগুনা। তারপর কি মাগুনা? তারপর, তুমি উঠে দাঁড়াও। হাত ঠিকভাবে ঝুলিয়ে রাখ। এ্যাটেন্‌শন্‌! মাথা উপরে তোল! আরও উপরে! কাঁধ আরও পিছনে নিয়ে যাও! টুঁ শব্দ কোরো না শয়তান!

মেজর তার হাতটা পিছনদিকে নিয়ে এলো, তারপর তার হাতের বেতটা দিয়ে মাগুনার মুখের উপর সজোরে আঘাত করলো। ডান দিক হতে বাঁ দিকে, বাঁ দিক হতে ডান দিকে। তারপর আবার ডান দিক হতে বাঁ দিকে, এবং আর একবার বাঁ দিক হতে ডান দিকে। মাগুনা সামান্য একটু কেঁপে উঠলো এবং প্রতিবার আঘাতের সাথে সাথে একটু নড়ে উঠলো কিন্তু এই আঘাত সে নিজের প্রাপ্য বলেই গ্রহণ করলো।

—মাগুনা, আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি—তার কারণ তুমি আমার বন্ধু ক্যাপ্‌টেনকে নিরাপদে রাখতে পারনি।

মেজর সৈনিকদের ডাকলো এবং মাগুনাকে বন্দী করবার আদেশ দিল। তার পূর্ব্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুর এই একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যটিকে মেজর এড়িয়ে যেতে চাইলো।

হেডকোয়ার্টারের সমর্থনের জন্য মেজর যে তালিকা তৈরী করেছিল তার শেষে আর একটি বিষয় যোগ করবে স্থির করলো। সেটা হচ্ছে এই—ক্যাপ্টেন ল্যুরাদ্-এর হত্যাকারীদের অসৎ উপায়ে সাহায্য করবার অভিযোগে সার্জ্জেণ্ট মেজর মাগুনার মৃত্যু-দণ্ড এবং কর্ত্তব্য অবহেলা করবার অভিযোগে বার্ণার্ড ও ফিলিপের সামরিক বিচার।

মেজর ভাবলো—এইবার কেউ আমাকে এই দোষ দিতে পারবে না যে, কারও প্রতি—সে বেলজিয়ানই হোক বা আমাদের নিজেদের লোকই হোক—আমি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করেছি।

মনে মনে মেজর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হোলো। তার স্থির ধারণা হোলো, এইবার তার পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে যাবার আদেশ প্রত্যাহৃত হবে। তার এই জয়লাভে সে উৎসব করবে স্থির করলো। তারপর সে তার জ্যাকেটের বোতাম খুললো এবং একটা গুপ্ত পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা মরক্কো বাঁধাই নোটবুক বার করলো। নোটবুকটা দেখতে অবিকল মৃত ক্যাপ্টেনের ডায়েরীর মত। ব্রুশেল্স্ অধিকারের প্রথম দিকে সে ও ক্যাপটেন্ একটা দোকানে এই রকম অনেকগুলি নোটবই খুঁজে পেয়েছিল। মেজর তার খাতা খুলে লিখলো—রাত্রিকাল। ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। আজ আমরা উৎসব করবো। আমেন্।

*　　　*　　　*

মেজরের ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পরেই লেত্তুলেৎ ফিরে এলো। সব কথা শুনে সেও খুসী হোলো। এ্যালবার্ট ভ্যান্ একেনের মৃত্যু এমন এক সময়ে হয়েছে যখন তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ইঞ্জিন ও রেলের কামরাগুলি পরিদর্শন করা হয়েছে, মেরামতী কাজ শেষ হয়েছে, ট্রেণ সাজানো হয়েছে। এখন বাকী শুধু সৈন্য ও মাল বোঝাই করে ট্রেণ ছেড়ে দেওয়া।

মেজরের মুখে ক্যাপ্টেনের হত্যা সংবাদ শুনেও কর্ণেল কিছুমাত্র বিচলিত হোলো না। প্রথম হতেই ল্যুরাদ্‌কে কর্ণেল পছন্দ করতো না। তার মতে, প্রাচীনপন্থী বৃদ্ধ লোকেরা আধুনিক যুদ্ধে অত্যন্ত অপটু। জার্ম্মানদের সামরিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করে তুলবার ক্ষমতা তাদের নেই। জার্ম্মান মনোভাবের বিরোধী

সব কিছুকেই ধ্বংস করবার জন্য একটা প্রলয়ঙ্করী ক্রোধ তাদের ইঙ্গিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে না। এমন কি উইল্‌হেল্‌ম্‌-এর সময়কার সৈনিকদেরও কর্ণেল পছন্দ করতো না—তার কারণ তারা অত্যন্ত অর্থ-লোভী এবং বিজিত জাতির প্রতি একটা জটিল খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি তাদের আছে। কিন্তু মেজরও কর্ণেলের কাছে প্রিয়পাত্র ছিল না। লেতুলেং-এর একটা অস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে, তার নিজের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি মেজরের ভিতরেও ফুটে উঠেছে, কিন্তু তার হুবহু প্রকাশ হয়নি। সেটা আরও সরল ও নির্ব্বোধ আকার ধারণ করেছে।

—কোন একটি সহরে সৈনিকদের অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ দেওয়া; বন্দী স্ত্রীলোকদিগকে সৈনিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া—এগুলি সেনাপতির উপযুক্ত কাজ এবং সর্ব্বাধিনায়কত্বের প্রশস্ত ইঙ্গিত। কিন্তু যখন কোনো হতভাগ্য আত্মসম্মান-বোধহীন অফিসার এক ফোঁটা মদের জন্য হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, বা কোন বিবর্ণ অনিচ্ছুক স্ত্রীলোককে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে আসে—সেটা অন্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

লেতুলেং তার সাথে মেজরের পার্থক্য এই ভাবে চিত্রিত করতো।

কিন্তু এই হত্যাকার্য্যের শাস্তি হিসাবে মেজর যে সমস্ত প্রস্তাব করলো, তাতে লেতুলেং সম্মতি জানালো। হেড্‌কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করবার সময় সে মেজরের সমস্ত প্রস্তাব অনুমোদন করলো। ক্যাপ্‌টেনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে সে একথাও লিখলো যে, তার মতে মেজরকে রক্ষী সৈন্য ও রেল-জংসনের অধিনায়ক হিসাবে তার পূর্ব্ব পদ হতে স্থানান্তরিত না করাই ভাল। রাশিয়ার বিপদসঙ্কুল পথে মেজরের মত একটি লোককে সঙ্গী করবার ইচ্ছা কর্ণেলের ছিল না। মেজরকে সে বললো যে, সে তার পক্ষ সমর্থন করে হেডকোয়ার্টার্সে চিঠি লিখেছে। কর্ণেল চাইতো, তার প্রতি অন্য লোকের একটা কৃতজ্ঞতা-বোধ থাকুক। সে মনে করতো—প্রকৃত যোদ্ধার একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য এই যে, সে অল্পবয়স্কদের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি কামনা করবে।

কিন্তু লেতুলেং-এর নিজেরও একটা কর্ত্তব্য ছিল। সৈনিকোচিত আদেশানু-বর্ত্তীতা ও কর্ত্তব্যের প্রতি সচেতনতা তার রক্তের সাথে মিশে ছিল। সহরের

প্রধান অফিসার হিসাবে সে এই জার্ম্মান ক্যাপ্‌টেনের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একটা তদন্ত করা তার কর্ত্তব্য বলে মনে করলো—যদিও এই প্রুশিয়ান ল্যুরাদ্‌কে কর্ণেল অত্যন্ত অপছন্দ করতো।

কর্ণেল একটা দ্রুত তদন্ত করবে বলে স্থির করলো। বন্দী সার্জ্জেণ্ট-মেজরকে সে তার সম্মুখে উপস্থিত করতে বললো।

কর্ণেলের সামনে দাঁড়িয়ে মাগুনা মনে মনে ভাবলো—যদি কর্ণেল আমাকে নির্দ্দোষ বলে মনে করে এবং আমাকে মুক্তি দেয়, তবে মেজরের সাথে আমি বোঝাপড়া করবো এবং ক্যাপটেনের মৃত্যুর শোধ বেলজিয়ানদের উপর এমনভাবে নেব যে, তারা বহুদিন সেটা মনে রাখবে। কিন্তু মেজরের মত কর্ণেলও যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে, তবে আমি দলত্যাগ করবো। যাই হোক, বেলজিয়ানরা খুব খারাপ লোক নয়। যে ভাবে হোক আমি সহরবাসীর সাথে একটা যোগসূত্র খুঁজে বার করবো এবং তারা আমাকে আশ্রয় দেবে।

মাগুনা মনেমনে একটা চিঠির খসড়া করে ফেললো। চিঠিটা সে লিখবে বিখ্যাত ম্যাথু ভ্যান্ একেনকে—যাকে জার্ম্মানরা ঠিক সেই মুহূর্ত্তে খুঁজে বেড়াচ্ছে। চিঠিতে সে লিখবে—আমি, সার্জ্জেণ্ট-মেজর মাগুনা আপনাকে জানাচ্ছি যে, হিটলারীয় শাসন-পদ্ধতির অসারত্ব সম্পর্কে আমার মনে একটা স্থির বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। আমি এখন নিশ্চিতরূপে ফ্যাসিষ্টবিরোধী। আমি এবং আমার সহকর্ম্মীরা এই ঘৃণিত বন্ধন হতে মুক্ত হবার সুযোগের অপেক্ষা করছি।

অবশ্য এই চিঠিটা সে লিখবে যদি বেলজিয়ানরা তাকে আশ্রয় দেয় এবং তার অতীত কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে কোন খোঁজখবর না করে।

লেতুলেৎ-এর প্রশ্নে তার চিন্তা বাঁধা পেল। মাগুনা তার উত্তরের ভিতর দিয়ে প্রথমতঃ মেজরের নামে অপবাদ দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু অধীনস্থ লোকের মুখে কর্ত্তৃপক্ষের অপবাদ শুনলে কর্ণেল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো। মাগুনার কাছ থেকে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করে কর্ণেল আবার তাকে বন্দী করবার আদেশ দিল এবং তাকে এই বলে শাসালো যে, তার সম্পর্কে কঠোর বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।

মাগুনার বিবৃতি শুনে একটি বিষয়ে কর্ণেলের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হোলো।

বিষয়টি হচ্ছে—ম্যারিক। স্ত্রীলোকটিতে সে তার সামনে উপস্থিত করতে বললো এবং তাকে সে নানা প্রশ্ন করলো। ম্যারিক একটি প্রশ্নেরও জবাব দিল না।

ম্যারিককে দেখে কর্ণেল বুঝতে পারলো—স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত সুন্দরী; এর মত স্ত্রীলোককে শয্যাসঙ্গিনী করতে কর্ণেলের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ম্যারিককে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অত্যন্ত অন্যমনস্ক এবং নিষ্প্রভ ও নিরানন্দ বলে মনে হোলো। কর্ণেল জানে—ম্যারিকের মত স্ত্রীলোককে পেতে হলে,তার উপর বল-প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু কর্ণেলের পছন্দ অন্যরকম। সে এমন স্ত্রীলোককে চায় যে তার প্রতি শিষ্ট ব্যবহার করবে এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করবে। সেই শিষ্টাচার এবং সেই অনুরাগ যদি ভয় দেখিয়ে এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে সৃষ্টি করতে হয়—তবুও। এই ধরণের কয়েকটি প্রমত্তা মেয়ের স্মৃতি তার মনে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। ফ্রান্সের সেই কয়েকটা দিন—তাদের সাথে সেখানেই সাক্ষাৎ। শয়তান জানে—তাদের সেই প্রমত্ত কামনা ও আবেগ খাঁটি ছিল কিনা। তার মতে, প্রকৃত যোদ্ধাদের বিশ্রামের সময়ে এই সব মেয়ের প্রয়োজন আছে।

লেতুলেৎ মেজরকে ডেকে পাঠালো।

সে বললো—মেজর, তুমি ইচ্ছা করলে একটি প্রশ্ন স্ত্রীলোকটিকে করতে পার। ক্যাপটেনকে খুন করবার কাজে বৃদ্ধাটিকে প্ররোচিত করবার বুদ্ধিটা ওর নিজস্ব, না ওর একদল বুদ্ধিদাতা ও সাহায্যকারী আছে? যদি থাকে, তবে তারা কে? আমার কোন প্রশ্নের জবাব ওর কাছ থেকে পাইনি। মেজর, তোমার হাতে একটা ছড়ি আছে সহরের লোকেরা ঐ ছড়িটার বিশেষ প্রশংসা করে। সঙ্কোচ কোরো না, মেজর—আমরা সবাই তোমার অনুরাগী।

লেতুলেৎ মেজরকে পরীক্ষা করে দেখছিল। কিন্তু কর্ণেলের আশা ভুল প্রমাণিত হোলো। মেজর এক মুহূর্ত দ্বিধা করলো না—সে তার হাতের ছড়িটা দিয়ে ম্যারিকের মুখের উপর কয়েকবার আঘাত করলো। শুধু তাই নয়, প্রতি আঘাতের সাথে সাথে সে হেসে উঠলো। কর্ণেল তাকে থামিয়ে বললো—থাক্ হয়েছে। এবার তোমার সৈনিকদের আমরা কিছুটা আনন্দ দিতে পারি। তোমার দশজন লোকের

সাথে ওকে খামারের ভিতর পাঠিয়ে দাও। সেখানে ওরা ওর সঙ্গে স্ফূর্তি করুক। তুমি কি বলো মেজর ?

যদিও ম্যারিক জার্ম্মান ভাষা বুঝতো, কিন্তু তার এই কথা শুনে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কর্ণেল বলে চললো—আর মেজর, সেই ফাঁকে এসো আমরা একটু মদ্যপান করি। তোমার উপর আমি খুসী হয়েছি। আমি অনুমতি দিচ্ছি, রাত্রের খাবার টেবিলে দিয়ে যেতে বলো।

মেজরের ভয় ছিল, ম্যারিককে জেরা করবার সময় হয়ত কোন বিপদ হতে পারে। এখন সে ভয় আর তার রইলো না। তার মনে হোলো—ম্যারিক সম্পর্কে তার অনুরোধ জানাবার এই হচ্ছে সুযোগ।

—কর্ণেল, স্ত্রীলোকটিকে সৈনিকদের হাতে ছেড়ে কি লাভ ? ও কাজটা আমি নিজেই করতে পারব। তোমাকে অনুরোধ করছি, স্ত্রীলোকটিকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।

যে কোন লোককে তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ধরতে পারলে লেতুলেৎ খুব খুসী হোতো। মেজরের অনুরোধ শুনে সে প্রচণ্ড আনন্দ পেল। তারপর সে মুখের একটা শুষ্ক ভাবহীন ভঙ্গী করে ম্যারিককে সরিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিল। মেজরকে সে কর্তৃত্বের সুরে বললো যে, সে মুখে মুখে যে আদেশ-পত্র বলবে; সেটা সে যেন লিখে নেয়। তারপর আজ রাত্রের মধ্যে রেলষ্টেশনে, রেল-লাইনে স্কোয়ারে, রাস্তায় সর্ব্বত্র এই আদেশপত্র ঝুলিয়ে দিতে হবে।

"বেলজিয়াম ও বৃহত্তর জার্ম্মানীর সহযোগিতার বিরোধী সমস্ত শত্রুকে আমরা নিষ্করুণভাবে ধ্বংস করব। আমরা জানি, ম্যাথু ভ্যান একেন এই সহরেই আছে। যে তার সন্ধান দিতে পারবে, তাকে পঞ্চাশ হাজার মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে। ষ্টেশনে, রেল-লাইনে বা সহরে জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ যদি সামান্য বাঁধা পায়, তবে ম্যাথু ভ্যান্ একেনের স্ত্রী ম্যারি ভ্যান্ একেনকে সেই মুহূর্ত্তে ফাঁসী দেওয়া হবে। তাকে জামিন হিসাবে বন্দী করা হয়েছে এবং সমস্ত জার্ম্মান ট্রেণের ইঞ্জিনে সে থাকবে।"

তারপর ম্যারিককে বাড়ীর বাইরে রেল-ষ্টেশনের কাছে বন্দীশালায় নিয়ে আসা হোলো।

* * *

সঙ্কেতকারীরা তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, দ্বিতল ও ত্রিতলের জানালায়, সর্ব্বত্র তারা স্থান করে নিয়েছিল। ষ্টেশন হতে সুরু করে পশ্চিম দিকে, তারপর দক্ষিণ-পূর্ব্বে ব্রিজ পর্য্যন্ত সমগ্র রেল-লাইনের উপর তারা নজর রেখেছিল। ব্রিজ আর কসাইখানার ভিতর দূরত্ব খুব বেশী ছিল না।

তেইশজন লোকের একটি বিচ্ছিন্ন দল হাতবোমা, অটোমেটিক রাইফেল, লৌহদণ্ড ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ব্রিজের চারপাশে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। ম্যাথুর কাছ থেকে সঙ্কেত পেলেই তারা ছুটে বেরিয়ে আসবে এবং ট্রেণ আসবার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর ব্যূহ ভেদ করে ব্রিজের কাছে পৌঁছবে।

স্মিসেনের ঘরে বসে একটা ধূম-উদ্গীরণকারী আলোর সামনে বসে ম্যাথু তার স্কাউট্‌দের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছিল।

সংবাদ যা এলো, সব আশঙ্কাপূর্ণ। সহরের ভিতর এবং উপকণ্ঠে লাইনের ধারে ধারে জার্ম্মানরা কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। ব্রিজের ধারে একটা সাম্‌নাসাম্‌নি আক্রমণ সম্ভবপর হবে কিনা—এ সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হোলো। মনের ভিতর দুশ্চিন্তা নিয়ে ম্যাথু লেসানফাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।—লেসানফাঁ ম্যারিকের সংবাদ নিয়ে আসবে।

আয়োচিম্ বাইরে গেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল—ষ্টেশনের আশে পাশে ঘুরে অবস্থাটা বুঝে নেওয়া। ফিরে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে সে তার টুপিটা ছুঁড়ে টেবিলের উপর ফেললো, তারপর চুল্লিটার কাছে একটি পুরনো ভাঙ্গা আর্মচেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লো। একটি কথা না বলে সে আগুনে হাত দুটো গরম করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর সে বললো—আমার মনে হয়, আমাদের সরে দাঁড়ানো উচিত। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। হ্যাঁ, আর একটা কথা—বৃটিশ-বেতারের আর একটা খবর আমি শুনলাম। রুশরা মস্কোর কাছে জার্ম্মানদের উপর আবার

প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে এবং জার্মান-ব্যূহ ভেদ করেছে। মস্কোর উত্তরে ভল্‌গা অতিক্রম করে তারা জার্মানদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

ম্যাথু জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কি বলছো, আয়োচিম? এ'সময়ে যদি আমরা চুপ করে বসে থাকি, সে তো জার্মানদেরই সাহায্য করা হবে। তুমি কি তাই চাও?

—আমি শুধু বলতে চাইছি যে, আমি ষ্টেশনের সীমানার ভিতর চেষ্টা করেও ঢুকিতে পারিনি। ওখানে কি ব্যাপার হচ্ছে, আমরা কিছুই জানি না। আমাদের প্ল্যান্ সম্পর্কে রেলশ্রমিকরা কিছুই জানে না। এ'অবস্থায় কোন ঝুঁকি নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

আয়োচিমের কথাবার্ত্তা শুনে ম্যাথুর মনে হোলো ও কিছু একটা চেপে রাখছে। অন্য কোন কারণ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আয়োচিম কোন কথা খুলে বললো না।

আয়োচিমের ইঙ্গিতে লেসনফাঁ ও ভ্যান্ দার স্মিসেন্ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ঘরের ভিতর আয়োচিম ও ম্যাথু ছাড়া আর কেউ রইলো না। আয়োচিম একটা ভাঁজ করা বিজ্ঞাপন একটা গুপ্ত পকেট হতে বার করে ম্যাথুর হাতে দিল।

—এটা পড়ে দেখ, ম্যাথু।

বিজ্ঞাপনটি কর্ণেল লেতুলেং-এর একটি ঘোষণাপত্র। তাতে লেখা আছে যে, ম্যারিককে জামিন হিসাবে আটক করা হয়েছে এবং ম্যাথু যে সামরিক ট্রেণটিকে আক্রমণ করবে বলে স্থির করেছে, সেই ট্রেণের ইঞ্জিনে ম্যারিক থাকবে।

—ম্যাথু, আমি বলছি না যে, এই বিজ্ঞাপনটাই আমাদের সরে দাঁড়াবার পক্ষে চরম যুক্তি। কিন্তু অন্যান্য করণের সাথে মিলিয়ে তোমার সমস্ত জিনিটা আবার বিবেচনা করে দেখা উচিত।

আয়োচিম হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

—আমি এখন যাই, ম্যাথু। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। দশ মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসব। তুমি সমস্তটা ভাল করে ভেবে নাও এবং যা স্থির করবে, আমাকে জানিও।

আয়োচিম চলে গেল।

সমস্ত বিষয়টির একটা বাস্তব দিক আছে—সে সম্পর্কে ম্যাথুর স্পষ্ট ধারণা ছিল। সম্মুখআক্রমণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ম্যাথু এক মুহূর্ত্তে মনস্থির করে ফেলেছে। মাটির তলা হতে বিস্ফোরকের সাহায্যে রেলের লাইন উড়িয়ে ফেলা এখন আর সম্ভব নয়! সময় অত্যন্ত কম। মাটির উপরে দাঁড়িয়ে লাইন ধ্বংস করতে হলে, সেটা সকলের চোখের উপরেই করতে হবে। দেরী করা অসম্ভব—ট্রেণ ছেড়ে চলে যাবে। আর ট্রেণ চলে যাবার পর রেলের লাইন ধ্বংস করবার কোন অর্থ হয় না! এই মুহূর্ত্তে রিজার্ভ ট্রেণ থামাবার ব্যবস্থা করতেই হবে, এই ট্রেণেই পূর্ব্ব রণাঙ্গনে সৈনিকদের পাঠানো হবে। কিন্তু ম্যারিক এই ট্রেণের ইঞ্জিনে থাকবে। ইঞ্জিন খানি সর্ব্বপ্রথম লাইনচ্যুত হবে। যদি কোন আশ্চর্য্য ঘটনার ফলে ম্যারিকের মৃত্যু না হয়, তবে জার্ম্মানরা তাকে হত্যা করে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে।

কোন অনুভূতি নেই, কোন চিন্তা নেই, ম্যাথু কেমন অভিভূতের মত বসে রইলো। সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে চেষ্টা করলো। তার পায়ে সে শক্তি পেল না, কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল এবং মাথার উপর যেন বিরাট একটা বোঝা চেপে রইলো। সে চিন্তা করতে চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে বুঝতে পারলো, তার মনে কোন চিন্তাই নেই।

বার বার একটি চিত্র তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল। সে যেন দেখতে পেল, জার্ম্মানরা ম্যারিককে মৃত্যু-দণ্ড দিচ্ছে। ম্যারিকের চোখ মুখ তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। আকাশের দিকে আর গাছের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে ম্যারিক? হয় ত ম্যাথুর কথা ওর মনে পড়ছে, হয়ত রেণীর স্মৃতি ওর মনে জাগছে। যে আকাশের দিকে ও তাকিয়ে আছে, সেই আকাশে রেণীর দৃষ্টি ত' আর কোনদিন পড়বে না,—এই কথা ভেবে ওর চোখ দুটি বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। ম্যাথু যেন দেখল, ম্যারিককে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর বন্দুকের শব্দ—আর ম্যারিকের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল। পর পর দৃশ্যগুলি রূঢ় বাস্তবতা নিয়ে ম্যাথুর মনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো যেন। ম্যাথু দেখল, ব্রিজের ধারে চারদিক ঘেরা একটা খোলা জায়গায় ম্যারিকের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। কিছুটা দূরে

প্রহরীদের ব্যারাক্‌। সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি আসে। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন—ঘরের ভিতর চুল্লির আগুনের ধারে ধারে সহরবাসী উত্তপ্ত হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ পরে একটি প্রহরী ব্যারাক্‌ হতে বেরিয়ে আসে। ভারী বুট্‌শুদ্ধ তার একটি পা অন্ধকারে ম্যারিকের সুন্দর মুখের উপর পড়ে। প্রহরীটি হোঁচট্‌ খায়, এবং ম্যারিকের মুখের উপর একটা ক্রুদ্ধ পদাঘাত করে। তারপর সে বুটের ধাক্কায় ম্যারিককে ঠেলে সরিয়ে দেয়। নোংরা জলে ভর্ত্তি একটি গভীর গর্ত্তের ভিতর ম্যারিকের দেহ গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ে।

একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে ম্যাথু উঠে দাঁড়ায়। নিজেই নিজেকে সম্বোধন করে বলে—সময় হয়েছে। এগিয়ে চলো। যে কাজ করব বলে স্থির করেছি, তা সম্পন্ন করতেই হবে।

ম্যাথু কোট গায়ে দেয় এবং টুপিটা হাতে নেয়। টুপিটা মাথায় পরবার সময় হঠাৎ তার মনে একটা দ্বিধা আসে। তার মনে হয়, টুপিটা মাথায় পরবার সাথে সাথে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও যেন একটা সমস্যা রয়ে গেল যার সমাধান তাকে করতে হবে, একটা প্রশ্ন রয়ে গেল যার বিস্তৃত আলোচনা নিজের সাথে সে করেনি। সে আবার বসে পড়ে। টুপিটা তার হাত থেকে মেঝের উপর পড়ে যায়। সে জানালার কাছে সরে আসে এবং জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে রাত্রির অন্ধকারে চারদিক কালো হয়ে উঠেছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ম্যাথু আবিষ্কার করে, সে নিজের কর্ত্তব্যের কথা ভাবছে না, সে ভাবছে রুশদের কথা। রুশরা যদি জার্ম্মানদের পিশে মেরে ফেলতে পারে, তবে কি চমৎকারই না হয়। একথা ভাবতেই ম্যাথুর কাছে সব কিছু সহজ ও সরল হয়ে ওঠে।

একটি পুরানো কথা তার মনে পড়ে। তখন তার বয়স সাত বছর। মা'র কোলে বসে সে গভীর মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনতো এবং স্বপ্ন দেখতো সে বড় হলে বীর ও যোদ্ধা হবে।…

এত ভাববার কি আছে? সময় হয়েছে—এগিয়ে চল। কথাগুলো ম্যাথু জোরে উচ্চারণ করে। সে একবার উঠে দাঁড়ায় কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবে আবার বসে পড়ে।

তার চোখ হতে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। চোখের সামনে তখনও সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে জার্ম্মান সৈনিকটি তার ভারী বুটের শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে, এবং ম্যারিকের সুন্দর মুখখানিকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ম্যারিক স্থির হয়ে পড়ে আছে, সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছে, একটি লোকও তার কাছে আসছে না। টেবিলের ধারে মাথাটা চেপে ধরে ম্যাথু আর্ত্ত চীৎকার করে ওঠে। নিজের উপর সে ক্রুদ্ধ হয়। এই একটি চিন্তা বারবার কেন তার মনে আসছে! জার্ম্মান প্রহরীর বুটের তলায় ম্যারিকের সুন্দর মুখ দলিত হচ্ছে—এ দৃশ্য কেন সে তার মন থেকে মুছে দিতে পারছে না! হয়ত কোনদিন সে এই কথাটি ভুলতে পারবে না! সহসা ম্যাথু উঠে দাঁড়ায়, টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরে এবং দ্রুত পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

পাশের ঘর দিয়ে যাবার সময় তার পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। একটা নিশ্চল ও ভারী অন্ধকার ম্যাথুকে ঘিরে ধরে। ম্যাথুর মনে হয়, ঠিক এইরকম নিঃসঙ্গ অন্ধকার সে এতক্ষণ কামনা করছিল।

সেই অন্ধকারে অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে ম্যাথু স্থির হয়ে দাঁড়ায়। সে ভাবে—নিজের মনের সাথে আমি একটা বোঝাপড়া করব, কোন কিছু না লুকিয়ে সমস্ত বিষয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করব। এখন সে তার চিন্তাকে কান পেতে শুনতে পারে। কোন ব্যাঘাত হবে না, এতটুকু শব্দ উঠবে না, আলোর ক্ষীণতম একটি রেখা কোথাও ঝল্‌সে উঠবে না। তার চিন্তা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সে যেন দেখতে পায়, সে এবং তার কমরেড্‌রা এগিয়ে চলেছে আর ওদিকে ট্রেণ আসবার শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। জার্ম্মান প্রহরীদের তারা পরাজিত ক'রে, তারা আরও এগিয়ে আসে,—তারপর ট্রেণ যখন চোখের উপর তারা দেখতে পাচ্ছে, সেই সময় হাতবোমা ও লৌহদণ্ডের সাহায্যে তারা ট্রেণের লাইন উড়িয়ে দেয়। এই কাজটিকে আরও নিখুঁত ভাবে আরও দ্রুত কি ভাবে সম্পন্ন করা যায় সেই কথাই সে ভাবে। একটা নতুন উন্মাদনা, নতুন শক্তি, নতুন আগ্রহ, নতুন প্রাণশক্তি ম্যাথু অনুভব করে। ছুটোছুটি মারামারি করবার একটা শিশুসুলভ ইচ্ছা তার মনে জাগে। যে কোন বিপদে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সর্ব্বপ্রকার সংগ্রামের জন্য সে প্রস্তুত। সে স্পষ্ট

বুঝতে পারে, এই মুহূর্তে সে যে কোন দুঃখ সহ্য করতে পারে, কোন কিছুতে সে ভয় পাবে না, সংগ্রামের অগ্নি-স্পর্শে সে এখন জ্বলে উঠেছে।

সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে—এই অক্ষয় ও অপরাজেয় প্রাণ-শক্তি সে পেল কি করে? চোখের উপর প্রিয়জনের মৃত্যুর কথা ভেবে ম্যাথু শিউরে ওঠে। পৃথিবী বেঁচে থাকবে অথচ রেণী ও ম্যারিক নেই—এই ক্ষতি সে সহ্য করবে কি করে? কিন্তু ম্যাথু বুঝতে পারে, অপূরণীয় ক্ষতিকে হাসিমুখে সহ্য করা, উদ্দেশ্যের প্রতি সদা-জাগ্রত আনুগত্য নিয়ে দুঃখকে জয় করা—সেই তো প্রকৃত প্রাণ শক্তির প্রকাশ সেই তো তার প্রেরণার উৎস। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দিয়ে হাসিমুখে সে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হবে। ক্ষতি—অপূরণীয় ক্ষতি যদি না থাকে তবে প্রকৃত জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যকে জয় করার ভিতরেই জীবন, দুর্ভাগ্যহীনতা জীবন নয়।

লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সাথে সে হাত মিলিয়েছে—এক অক্ষয়, অমর ও অনন্ত উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্কল্প নিয়ে। কোন ক্ষতি আজ তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না।

যে শক্তি ও সাহসে সে ভরে উঠেছে, তার মনে হোলো—সুখের চেয়ে তা উচ্চতর ও মহত্তর। সুখের ভিতর যেমন সন্তোষ আছে, তেমনি একটা ভয়ও আছে। ভয়—এই মুহূর্ত্তটি চলে যাবে, এই মুহূর্ত্তটি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু একটা মহান, অক্ষয় ও অনন্ত উদ্দেশ্যকে সে গ্রহণ করেছে। সম্ভাবিত পতন ও অনিশ্চিত দুঃখের প্রতি একটা প্রতিরোধ তার ভিতর সৃষ্ট হয়েছে একটা স্থির উৎসুক প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছে—সে হার মানবে না, একটি মুহূর্ত্তের জন্যও সে বিশ্রাম নেবে না, নব নব সৃষ্টির ভিতর প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে সে নতুন ভাবে চলা সুরু করবে, তার নবজন্ম হবে।......

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ম্যাথু দরজার কাছে এলো। হলঘরের আধ-অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্ত্তি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। আয়োচিম তাকে জিজ্ঞাসা করলো—বাইরে যাচ্ছ, ম্যাথু? এত তাড়াতাড়ি?

—আমি প্রস্তুত।

—ভাল করে ভেবে দেখেছ, ম্যাথু?

—হ্যাঁ, দেখেছি।

—এত তাড়াতাড়ি? আমি তো এখনও বাইরে যাবার সময় করে উঠতে পারলাম না। কি ঠিক করলে, ম্যাথু?

—যা করা উচিত, তা করতেই হবে। চল যাই।

আয়োচিম মনে মনে ভাবলো—এই লোকটি কি কখনও দ্বিধা করতে জানে না? ওকে কি করে বুঝিয়ে বলি, কেন আমি অন্য কোথাও যাইনি, কেন আমি এতক্ষণ এখানে ছিলাম?

—আয়োচিম, চল যাই। ভোর হবার আগে আমাকে আর একটা কাজ করতে হবে।

ম্যাথুর মনে পড়লো, ট্রেণ আক্রমণ সুরু করবার আগে এ্যালবার্টকে সে খুঁজে বার করবে এবং তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি তাকে সে দেবে।

আয়োচিম বললো—এত তাড়া কিসের? একটু অপেক্ষা করো; ভোর না হলে ট্রেণ ছাড়বে না।

সিঁড়ির নীচে ভাঁড়ার ঘরের দরজা খুলে আয়োচিম কাকে যেন ডাকলো—বেরিয়ে এস!

অন্ধকারের ভিতর হতে ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে এ্যালবার্ট বেরিয়ে এলো।

দুই ভাইকে একা রেখে আয়োচিম রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

পায়ের শব্দ শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাথু তার ভাইকে চিনতে পেরেছিল।

ম্যাথু জোর করে একবার কাশ্‌লো। এ্যালবার্ট বুঝতে পারলো, তার ভাইয়ের এই ইঙ্গিতের অর্থ সে নিজে কথা বলতে চায় না—সব কথা শুনতে চায়। তার দাদার হাবভাব ও ইঙ্গিত এ্যালবার্ট কত স্পষ্ট বুঝতে পারে! তার পদস্খলন হয়েছে বলেই আজ স্থির-শক্তি-সম্পন্ন ম্যাথুর প্রতি সে কি গভীর ভালবাসা অনুভব করছে! তার উপর সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী সে এখন দ্বিধাহীনভাবে ম্যাথুর কাছে খুলে বলবে, তার সমস্ত ভুল স্বীকার করবে এবং সংগ্রামের জন্য নতুন শক্তি প্রার্থনা করবে। বিদেশী শাসকের কাছে যাঁরা মাথা নত করেনি, এ্যালবার্ট তাঁদের দলভুক্ত হতে চায়—একথা ম্যাথু শুনলে কি খুসীই না হবে!

তার নিজের বাড়ীর কুঠ্‌রীতে বসে বসে এ্যালবার্ট এইসব চিন্তাই করেছে। ম্যাথুর সাথে মুখোমুখি সাক্ষাতের মুহূর্ত্তটি অবশেষে এলো।

কিন্তু এ্যালবার্ট কথা স্থরু করবার আগেই ম্যাথু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো এবং দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে দিল। এ্যালবার্টের মনে হোলো, ম্যাথুর চোখে মুখে একটা দৃঢ় সচেতনতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবসর এ্যালবার্টের তখন ছিল না। অন্য একটি বিষয়ে তার মনোযোগ একাগ্র হয়ে উঠেছিল—তার প্রতি ম্যাথুর স্নেহহীন ও কঠোর ব্যবহার।

অন্য সময় হলে এ্যালবার্ট একটি কথা না বলে উঠে চলে যেত। কিন্তু এখন তার জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন: জনসাধারণের ভিতর জীবন, জনসাধারণ হতে নিষ্করুণ নির্ব্বাসনে মৃত্যু।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ্যালবার্ট কথা বললো। কিন্তু যেভাবে বলবে ভেবেছিল, তা হোলো না। ছেলেবেলায় ম্যাথুর সাথে যেভাবে কথা বলতো, তেমনি আন্তরিকতা কথার ভিতর রইল না। যে গভীর ও অসঙ্কোচ অনুতাপে তার অন্তর ভরে উঠেছিল, তার আভাষ কথার ভিতর ফুটে উঠলো না।

এ্যালবার্ট বললো—দেখ ম্যাথু, আমি নিজেই তোমার কাছে এসেছি।

—যদি তুমি না আসতে, আমি নিজেই তোমাকে খুঁজে বার করতাম।

—কিন্তু আমি তো এসেছি। আমি দুঃখিত, ম্যাথু। আমার কথা কি তুমি শুনছ না ম্যাথু? তুমি কি আমার কথা শুনতে চাও না? আমি কথা বলছি, কিন্তু তুমি অন্য কাজে ব্যস্ত। পকেট হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজছ তুমি? তোমার কাজ শেষ হোক, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করছি।

—থেমো না—বলে যাও।

—আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। ক্ষণিক, শুধু একটি মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাকে তুমি ক্ষমা করো। এই দেখ, তুমি আবার তোমার পকেট হাতড়াতে ব্যস্ত। আমাকে সোজাসুজি বলে দাও, আমার কথা তুমি শুনতে……চাওনা ……ওকি, পকেট থেকে ওটা কি বার করলে?

ম্যাথু চীৎকার করে বললো—যা বলতে এসেছ, তাই বলো।

—বোধ হয় আমার কথা তোমাকে ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারিনি।·····আচ্ছা বেশ, ক্ষণিক দুর্ব্বলতা না বলে আমি বলছি—ভুল।······তবুও তোমার ক্রোধ শান্ত হোলো না। বেশ, ভুল নয়, আমার পতন। আমি আন্তরিকভাবে বলছি—আমার পতন। কিন্তু আমি আশা করি আমার দ্বারা কোন অপকার······

ম্যাথু উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালো।

—তুমি আশা করো?

এ্যালবার্ট বললো—বিশেষ অপকার হয়নি। যদি করে থাকি, তবে এখন হতে তার প্রায়শ্চিত্ত করব······

ম্যাথু ক্রোধে জ্বলে উঠলো এবং সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলে চীৎকার করে উঠলো—তুমি কোন অপকার করোনি, এই "আশা" করবার সাহস তুমি পাও কি করে? তুমি কি করেছ তা যদি বুঝে না থাক—তবে আমরা কি চাই তাও তুমি জান না। একটি কথা বোলো না—চুপ করে থাকো। আমাকে তুমি জান। যদি আবার নিজের দোষ কাটাতে চেষ্টা করো, তবে তোমার পক্ষে ভাল হবে না।

কিন্তু এ্যালবার্ট কথা বলবার চেষ্টা করলো।

—একটি কথাও নয়। ম্যাথু গর্জ্জন করে উঠলো।

এ্যালবার্ট চুপ করলো। ম্যাথু কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করলো: তার ভাই কি আবার কথা বলতে চেষ্টা করবে? এ্যালবার্ট কোন কথা বললো না, ম্যাথু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো।

—যাক্; এবার আমার কথার বাধ্য হয়েছ। চুপ করে বসো, নড়বার চেষ্টা কোরো না। ঠিক, এবার নিজে কথা বলবার চেষ্টা না করে, আমি যা বলছি শোনো। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি পকেটের ভিতর কি খুঁজছিলাম—কি খুঁজছিলাম, দেখবে? দেখ—দেখতে পাচ্ছ তো? একটা ছুরি। তোমাকে আমি খুন করতে চেয়েছিলাম······হ্যাঁ······তোমাকে······আমি! বুঝতে পারছ? তোমার জন্যই আমি এত মনস্তাপ ভোগ করেছি। অথচ রেণী কিংবা ম্যারিকের চেয়ে তোমাকে আমি কম ভালবাসতাম না।

ম্যাথু এক মুহূর্ত্ত চুপ করলো। সে একবার কাশতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার

গলা দিয়ে একটা আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এলো। এই আর্ত্তনাদ ম্যাথুকে ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত করে তুললো, যেমন উন্মত্ত সে হয়ে পরে তার কোন মানসিক অনুভূতি যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে। সে দরজার দিকে ছুটে গেল। পকেট হাতড়ে চাবি খুঁজল, পেল না। প্রচণ্ড আঘাতে নড়বড়ে দরজাটা সে ভেঙ্গে ফেললো এবং চীৎকার করতে লাগল—চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও! এই ছুরিটাও আমি ফেলে দিলাম! আপদ দূর হোক! তুমি কি করেছ, তা যদি বুঝে থাক, তাহলে তুমিই ছুরিটা কুড়িয়ে নেবে। আঃ, তুমি কি এখনও কিছু বুঝতে পারছ না? কেন তোমাকে আমি খুন করতে চেয়েছিলাম, তা কি তুমি জান না? তোমার ঐ ক্ষণিক দুর্ব্বলতার জন্য নয়। ক্ষণিক দুর্ব্বলতা—যেন ক্ষণিক হলেই আর কোন দোষ নেই। শুধু মিনিট নয়—প্রতিটি সেকেণ্ড এখন আমাদের কাছে মূল্যবান। তোমাকে খুন করতে চেয়েছিলাম তোমার ভুলের জন্য নয়, তুমি আমাদের যে অপকার করেছ—তার জন্য। এর কোন ক্ষতিপূরণ নেই। যখন আমরা খাদের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই সময় তুমি দলত্যাগ করলে। সেকথা কি আমরা ভুলতে পারি? প্রত্যেকে চিরকাল মনে রাখবে: তখন তুমি শত্রুপক্ষে ছিলে। আমাদের বিজয় তোমার কাছে চিরকাল অভিশাপ বলে মনে হবে। চিরকাল! তোমাকে যদি আমি খুন করতাম, সেটা বোধ হয় তোমার পক্ষে ভালই হোতো। হ্যাঁ খুন—সোজা স্পষ্ট খুন! ভাই হয়ে ভাইকে খুন! দূর হও! দরজা খোলা রয়েছে—যাও! এখন তুমি যতই অনুতপ্ত হও, কোন ফল হবে না।

কিন্তু এইবার এ্যালবার্ট অবাধ্য হোলো।

এ্যালবার্ট তার ভাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল।

—ঘরের ভিতর এস, ম্যাথু। আমি দরজা বন্ধ করবো। তোমার সঙ্গে আমি শেষবারের মত একটা মীমাংসা করতে চাই। তুমি একটি আত্মম্ভরী নির্ব্বোধ। এবার আমি তোমাকে আদেশ করবো। আমার শরীরেও তোমার মত ভ্যান্ একেন্ রক্ত বইছে। তোমার দুঃসাহস তো কম কম নয়! আমার জীবনের উপর রায় দিতে চাও! আমার ভবিষ্যতকে বেঁধে দিতে চাও! কি স্পর্দ্ধা! তুমি কি কোনদিন আমাদের উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করোনি? ধরে নিলাম সেটা আমার মত

তোমার একটা দুর্ব্বলতা নয়, সেটা তোমার ভুল বা নির্ব্বুদ্ধিতা। আমি আদেশ দিচ্ছি: চুপ করে বসে আমার কথা শোনো। তুমি আমাকে যতই অপমান করতে চেষ্টা করো না কেন, আমি তোমাকে রেহাই দেব না। আমি এখানে অনুতাপ প্রকাশ করবার জন্য আসিনি। আমি যে ভুল করেছি এবং যে অনিষ্ট করেছি, আমার ভাগ্য তার বিচার করবে। তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার জন্য আমি এসেছি। রণক্ষেত্রে সশস্ত্র সঙ্গীর সাহায্য কে না চায়? শত্রুর হাতে পুতুল হয়ো না। এই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তে তুমি কি সত্যিই আমাকে দূর করে দিতে চাও? এত বড় পাপ কাজে তোমার সম্মতি আছে?

ম্যাথু দরজার কাছ থেকে সরে এসে বাধ্যভাবে টেবিলের কাছে বসলো।

সে বললো—আমি শুনছি। বলে যাও।

—ম্যাথু, জার্ম্মানদের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও শাস্তির কথা সমস্ত পৃথিবী জানে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমাকে কি সহ্য করতে হয়েছে! তারা আমার উপর অদৃশ্য, সূক্ষ্ম, মানসিক অত্যাচারের নীতি প্রয়োগ করেছে। পৃথিবীর কোন লোক কি দেখেছে, কেউ কি জানে, জার্ম্মানরা তাদের শত্রুর নীতিগত ধ্বংসের জন্য কত সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছে? এই নৈতিক শাস্তি ভোগীদের দুর্গতি অন্য কারও চেয়ে কম নয়। জার্ম্মানদের কি এর জন্য দায়ী করা হবে? এর জন্য কি তাদের কৈফিয়ৎ দাবী করা হবে? না, তুমি শুধু তোমার হৃতশক্তি ধরাশায়ী ভাইয়ের উপর তোমার সমস্ত ক্রোধ বর্ষণ করে ক্ষান্ত হতে চাও?

শপথ করবার ভঙ্গীতে ম্যাথু তার দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করলো।

—এর জন্যও আমরা জার্ম্মানদের ক্ষমা করবো না।

—তাহলে ম্যাথু আমার কথা শোনো। মৃত্যুকে ভয় করি না। মৃত্যু-দণ্ডকে আমি হাসি মুখে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু মৃত্যুর দ্বার হতে ফিরিয়ে এনে তারা আমায় শাস্তি দিল। যখন আমি আবার বেঁচে উঠলাম, তারা আমার মন থেকে জয়লাভের সমস্ত আশা নির্ম্মূল করে দিল। সে-ই শেষ আঘাত এবং সে-ই আমার শেষ পতন। স্রোতের টানে যে লোকটি তলিয়ে যাচ্ছে, তার পিঠের উপর যদি ভারী পাথর চাপাও —তাহলে যেমন হয়, ঠিক সেই অবস্থা হোলো।

তারপর এ্যালবার্ট তার ভাইকে তার বিচারের কথা আগাগোড়া খুলে বললো।

—ম্যাথু, অজগর সাপের মত ওরা আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছিল; সেই বন্ধন খুলে আমি বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এই কয়েকঘণ্টার আতঙ্কময় স্মৃতি যে কোন ব্যাথার চেয়ে তীব্রতর। এর একটা বোঝাপড়া আমি করব, এর প্রতিশোধ আমি নেব। ম্যাথু, এ'জন্য আমি তোমার সাহায্য চাই। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে না ম্যাথু? তাও কি সম্ভব? ম্যাথু, ভালো করে ভেবে দেখ। আমি হয়ত একজন ভালো যোদ্ধাও হতে পারি। আর যদি তোমার সাহায্য না পাই, তবে আমি হতাশায় ভেঙ্গে পড়ব।

ম্যাথু উঠে দাঁড়ালো এবং এগিয়ে এসে এ্যালবার্টকে জড়িয়ে ধরলো।

—এ্যালবার্ট, আমি জানি তুমি দুঃখী। ভাই, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার জন্য আমি দুঃখিত। তোমার সঙ্গে দেখা হবার প্রথম মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলাম এবং তোমার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার উদ্ধত ও রুক্ষ স্বভাবের কথা তুমি জান; তোমার প্রতি যেন কোমল না হয়ে পড়ি, এই ভয়ে প্রথম হতেই আমি জ্বলে উঠেছিলাম এখন আমি প্রকৃতস্থ হয়েছি। তোমার প্রতি এখন আমি অনুকম্পা বোধ করছি, তোমাকে এখন আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা হচ্ছে। যাক্, তোমার সব কথা আমি শুনেছি। এবার তুমি যেতে পার—দরজা খোলা রয়েছে। তোমাকে আমরা আমাদের দলভুক্ত করতে পারব না।

ম্যাথুর উগ্র ক্রোধ এ্যালবার্ট সহ্য করতে পারে, কিন্তু দাদার এই ধীর ও শান্ত কথাগুলি তাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুললো।

—কেন, কেন তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ম্যাথু?

—তোমাকে দলে পেয়ে আমাদের শক্তি-বৃদ্ধি হবে না, আমরা আরও দুর্বল হয়ে পড়ব। সাহস সঞ্চয় করো। আমাদের জয়ের প্রতি তোমার আস্থা ছিল না। আমাদের আত্ম-বিশ্বাসকে তুমি টলিয়ে দিয়েছিলে, পরস্পরের ভিতর সন্দেহ সৃষ্টি করেছিলে। এই তোমার একমাত্র অপরাধ বা একমাত্র নৈতিক অধঃপতন নয়। ওজন করে, হিসাব কষে তুমি জানতে চেয়েছিলে—কোন দলের জয়লাভের সম্ভাবনা

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই তোমার দ্বিতীয় অপরাধ। আপন দেশের সাথে তোমার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। নিজের অপরাধকে স্বীকার করো, তারপর তোমার ভাগ্যে যাই থাক, সত্য পথ হতে তুমি বিচ্যুত হবে না। তুমি ভেবেছিলে, কতগুলি সুন্দর প্রাচীর মূর্ত্তির ভিতরেই দেশের মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে। তুমি ভুলে গেলে যে, তোমাকেই পতাকাবাহী হতে হবে, দেশের অম্লান গৌরবের মূর্ত্ত প্রতিমূর্ত্তি হবে তুমি। সমস্ত প্রাচীন সম্পদ ধ্বংস হতে পারে কিন্তু আমাদের বীরোচিত কার্য্যের স্মৃতি কোনদিন মুছে যাবে না। জয়ের জন্য সমস্ত কিছু বিসর্জ্জন দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। আমরা যদি ভীরু হই, তবে এই প্রাচীন বেদীর প্রতি তার চেয়ে বড় অপমান আর কিছু নেই। এই ভারী বোঝা বহন করবার জন্য নিজেকে তুমি প্রস্তুত করতে পারোনি। বিদায়! ভিন্ন মানুষ হয়ে তুমি আবার যখন ফিরে আসবে, সেই দিনের প্রতীক্ষায় আমি থাকব। যে দোষ তুমি করেছ, সমস্ত জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূর হতে আমরা তোমাকে সাহায্য করবো।

এ্যালবার্ট দরজার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সে বললো—তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, ম্যাথু। তুমি আমাকে ভালোবাসো না।

—যদি তুমি জানতে, তুমি আসার পূর্ব্বে আমি কি স্থির করেছি, তবে তুমি এ কথা বলতে না। তোমাকে কেন আমি ক্ষমা করতে পারলাম না, সেকথাও তুমি তাহলে বুঝতে পারতে। একদিন তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।

এ্যালবার্ট চলে গেল। দূর হতে ম্যাথু শুনতে পেল, এ্যালবার্ট আয়োচিমের ডাকের উত্তর দিল।

সেই স্তব্ধ নিরন্ধ্র রাতে দূর হতে এ্যালবার্টের গলার স্বর ভেসে এলো। সেই অত্যন্ত পরিচিত ও অত্যন্ত প্রিয় গলার স্বর ম্যাথুর মনে তার ছেলেবেলার স্মৃতি জাগিয়ে তুললো—একই আকাশের তলায় কত মধুর রাতের স্মৃতি, পুষ্পিত কাননের গন্ধবাহী বাতাসের স্পর্শ। ম্যাথুর ইচ্ছা হোলো, সে চীৎকার করে এ্যালবার্টকে ডাকে, তাকে জোর করে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু কেন?···না, কোন কারণ নেই। ও চলে যাক্।

*　　*　　*

এ্যালবার্টের পদশব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল এবং তার ছায়ামূর্ত্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুকনো ডালপালার শব্দ ম্যাথুর কানে ভেসে এলো, এ্যালবার্ট বোধ হয় বাব্‌লা-ঝোপের ভিতর দিয়ে বাদামতলার দিকে এগিয়ে চলেছে।

ম্যাথু তার যোদ্ধদল ও সাজসরঞ্জাম পরিদর্শন করলো। প্রত্যেকে ঘাঁটিতে সব প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পূর্ব্বাচলের দূর-আকাশে শুক-তারা দেখা দিল। শীতকালের দীর্ঘ-রাত্রির অবসান ঘনিয়ে এলো। ট্রেণ রওনা হবার এই সময়। কিন্তু কোন সঙ্কেত তো পাওয়া গেল না! জার্ম্মানরা কি আমাদের ফাঁকি দিল?— ম্যাথু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোলো।

আরও কিছু সময় কাটলো। তারাগুলি ম্লান হয়ে এলো। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সমস্ত শ্রবণ-শক্তি সজাগ করে ম্যাথু ও তার সঙ্গীরা কান পেতে রইলো; কিন্তু ট্রেণ আসবার কোনরকম শব্দ তারা শুনতে পেল না। নিথর বাতাস রুদ্ধ প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে রইলো, যেন সঙ্কেত পেলেই আবর্ত্ত তুলে উঠবে। কিন্তু কোন সঙ্কেত এলো না। ম্যাথুর ও তার সঙ্গীদের তীব্র উত্তেজনা একটা ক্লান্তিতে রূপান্তরিত হোলো।

ধীর মন্থর গতিতে সময় এগিয়ে চলল। চাঁদের আলো ক্রমশঃ নিষ্প্রভ ও ম্লান হয়ে এলো।

* * *

এ্যালবার্ট লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা বিষয়ে শুধু তার সজাগ দৃষ্টি ছিল—যেন সে কোন প্রহরীর মুখোমুখি না পড়ে। কোথায় সে চলেছে, কেন যাচ্ছে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা ছিল না।

গভীর হতাশায় তার কোন অনুভূতি ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে তার জোরে শিষ দিতে ইচ্ছা করছিল।

টাউনহলের অনতিদূরে গোল টাওয়ারের কাছে সে যখন পৌছল, সে সময় একদল টহলদারী সৈন্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্য তাকে গোল টাওয়ারের আড়ালে আত্ম-গোপন করতে হোলো। সেখান থেকে সমস্ত সহরটা তার চোখের সামনে ফুটে

উঠলো। রোমানদের তৈরী ব্রিজ্, সেন্ট জাষ্টিনের গীর্জ্জা, 'আণ্ডার দি সোয়ালোস উইংগ্' সরাইখানা, 'ষ্ট্রীট্ অব দি ফ্লেমিং গার্ল' নামাঙ্কিত রাস্তা।

এ্যালবার্টের মনে পড়লো সেই মেয়েটির কথা—যে কয়েকটি শিশুর প্রাণরক্ষা করেছিল; সেই ডাক্তারের কথা—যে নিজের প্রাণ দিয়ে মহামারীকে জয় করেছিল। সহরের অন্য সমস্ত তেজস্বী পুরুষের কথা তার মনে পড়লো। গত চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনাগুলি তার মনে পর পর রেখাপাত করে গেল। সে-ই ভোর বেলা যখন সে নিজের ঘরে বসে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে ওয়ালুন মিনিয়েচারটিকে পরীক্ষা করছিল আর তার পিসীমা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেছিল—তোমার সঙ্গে কয়েকজন লোক দেখা করতে এসেছে, বেল-বেল—সেই সময় থেকে সুরু করে সে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা ভাবলো।

টহলদারী সৈন্যদল পার হয়ে গেল এবং একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। এ্যালবার্ট বাইরে বেরিয়ে এলো। একটা স্তম্ভের উপর সদ্য-আঁটা একটা নোটিশ তার চোখে পড়ল। ম্যারিকের বিষয়ে সেই নোটিশটা এ্যালবার্ট তারার আলোয় পড়ে ফেললো।...ম্যাথুর কাছে আমি যখন অনুতপ্ত হয়ে গেলাম, তখন সে নিশ্চয়ই এ'বিষয়ে জানতো...এ্যালবার্ট মনে মনে ভাবলো।

সহসা এ্যালবার্টের মাথায় একটা নতুন চিন্তা এলো। সে একটা নতুন মতলব ঠিক করলো। সেই মতলবকে যথাসম্ভব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে সে দ্রুত বাড়ীর দিকে অগ্রসর হোলো। বেশ একটা উত্তেজনা সে অনুভব করছিল। কিন্তু নিজের মনকে সে শান্ত করলো এবং সতর্কভাবে পথ চলতে লাগল। এতক্ষণ পর সে তার লক্ষ্য-পথ খুজে পেয়েছে—সেইদিকে দৃষ্টি রেখে সে অগ্রসর হবে।

এ্যালবার্ট ভাবলো—ওরা যেমন কসাইয়ের মত অত্যাচার সুরু করেছে, তেমনি আমিও প্রতিশোধ নেব। ...যে বিস্ফোরণ হবে তার ফলে আমার রক্ষিত সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হ'য়ে যাবে...

এ্যালবার্টের মনে পড়লো—রাশিয়ানদের সম্পর্কে ম্যাথু কি বলেছিল। ...রাশিয়ানদের কাছে আমি নির্ভীক দেশপ্রেমের শিক্ষা নিতে চাই।

ভূগর্ভস্থ কক্ষে ঢুকে এ্যালবার্ট বিস্ফোরণের সমস্ত আয়োজন পরীক্ষা করে দেখলো এবং সল্‌তের মুখ গুপ্ত-পথের শেষে ঝোপের ভিতর নিয়ে গেল।

তারপর যখন সে আগুন ধরিয়ে দেবে বলে ঠিক করলো, তখন তার নীল-চক্ষু ম্যাডোনার কথা মনে পড়ল। নীল-চক্ষু ম্যাডোনা—যাকে দেখতে তার মা'র মতো।

ম্যাডোনার চোখদুটি তার মনে পড়্‌ল। সর্ব্ব দুঃখ দূর হবে এবং পৃথিবীতে গভীর আনন্দ ফিরে আসবে—এই বিশ্বাসে ম্যাডোনার চোখদুটি দ্যুতিমান। ম্যাডোনার মুখখানির কথা মনে পড়ল। বসন্তের প্রভাত-আলোর মত সে মুখ উজ্জ্বল। আর তার ঠোঁটে সেই ভোগজয়ী মৃত্যুজয়ী গভীর ধ্যানের হাসি।

এ্যালবার্ট আবার ফিরে গেল এবং মিউজিয়ামে উঠবার সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলো। উপরের ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই। বহু দূর হতে একটা অস্পষ্ট গোলমাল যেন আসছিল;—এ্যালবার্ট বুঝতে পারলো, হল-ঘর ও মিউজিয়ামের মধ্যস্থিত দরজা বন্ধ। এ্যালবার্টের মনে হোলো—চোখের পলকে সে সব কিছু করে ফেলবে: দরজার হাতল খুলবে, ভালুকের মূর্ত্তিটি একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেবে, ঘরের ভিতর ঢুকে ফ্রেম থেকে ছবির ক্যান্‌ভাসটা খুলে নেবে, ক্যান্‌ভাসটা সে গোল করে গুটিয়ে নেবে, তারপর ফিরে আসবে। নীল-চক্ষু ম্যাডোনাকে সে ধ্বংস করতে পারবে না। কোন দ্বিধা না করে এ্যালবার্ট উপরে উঠে গেল।

মিউজিয়ামের ভিতর ঢুকে সে দরজার হাতল যথাস্থানে স্থাপন করলো, ভালুকের মূর্ত্তিটাকে সরিয়ে আনলো। এখন যদি সে পদশব্দ শোনে, তবে সে একটা কোণে লুকিয়ে পড়বে—এবং সুযোগ-সুবিধা মত আবার সে ফিরে যাবে। ম্যাডোনার ছবিটা নিয়ে সে যখন চলে আসছে, ভালুকের মূর্ত্তিটা সরিয়ে দরজার হাতলটা তুলতে যাবে—ঠিক সেই সময় হলঘরের দরজা খুলে গেল।

লেতুলেৎ ও মেজর দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তারা এ্যালবার্টকে দেখলো। লুকোবার সময় আর ছিল না।

কিন্তু তখনও এ্যালবার্ট জার্ম্মানদের নাগালের বাইরে। দরজার হাতল তুলে সে

অনায়াসে লাফিয়ে পড়তে পারে। তারপর দরজা বন্ধ করতে পারলেই সে নিরাপদ। কিন্তু তাহলে জার্মানরা এই গুপ্ত-পথের অস্তিত্বের কথা জানতে পারবে।

এই সমস্ত চিন্তা এক মুহূর্ত্তের ভিতর এ্যালবার্টের মনে পড়লো—ম্যাথু সেদিন সকালে প্রথমেই খোঁজ করেছিল, গুপ্ত-কক্ষে বিস্ফোরক পদার্থ ঠিক অবস্থায় আছে কিনা। তারপর এ্যালবার্ট অনেক জল্পনা কল্পনা করে এই সিদ্ধান্ত করেছিল—ম্যাথু তার কোন প্রয়োজনে এই গুপ্ত-পথটিকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতে চায়। জার্মানদের বিরুদ্ধে ম্যাথুর সংগ্রামের পথে এ্যালবার্ট কোন বাধার সৃষ্টি করবে না। নিজের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে সে ম্যাথুকে সাহায্য করবে। ম্যাথুকে সে সাহায্য করবে—এই চিন্তা তার মনে একটা গভীর সন্তোষ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বহন করে আনলো। ভালুকের মূর্ত্তিটার কাছ থেকে সে সরে এলো এবং স্থির ভাবে অপেক্ষা করতে লাগল।

এ্যালবার্টকে তারা নানাভাবে উৎপীড়ন করলো,—কিন্তু তবু সে প্রকাশ করলো না, কি ভাবে সে মিউজিয়ামের ভিতর প্রবেশ করেছে। ভ্যান্ একেন বংশের শিশুরাও যে গোপনতার মর্য্যাদা রক্ষা করেছে, নিকটতম বন্ধুরাও সে তথ্যের সন্ধান পায়নি—শত্রুর কাছেও সেই গোপনতা ভঙ্গ হোলো না।

লেভুলেৎ এ্যালবার্টকে গুলি করবার আদেশ দিল।

বেঁটে ও গোলাপী-গাল সৈনিকদুটি মেজরের আদেশে এ্যালবার্টকে বাইরে নিয়ে গেল এবং তার আদেশের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগল।

বার্ণার্ড ও ফিলিপ এ্যালবার্টকে নিয়ে বাগানে গেল। শেষ রাতের ম্লান চাঁদ মাটির উপর ঝুলে পড়েছিল। মনে হোলো,—চাঁদের কোন গতি নেই—স্থির, নিশ্চল। উদাসী নিরুৎসুক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু দেখছে।

এ্যালবার্ট চাঁদের দিকে তাকালো। এই বাগানে আরও বহু চন্দ্রালোকিত রাতের কথা তার মনে পড়লো। মাথার উপর উদার আকাশের অসীম বিস্তৃতি, গাছের পাতায় ও শিশির-ভেজা-ঘাসে রূপালী আলোর সমারোহ। বসন্ত ও শরতের অশান্ত রাত! আকাশে চাঁদ উঠতো—কোন দূর দিগন্তের পানে তার চঞ্চল গতি! মেঘের স্তূপে চাঁদ ঢাকা পড়তো—আর মাঝে মাঝে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত্তের জন্য অকলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময়তায় বিজয়ীর মত তার প্রকাশ হোতো।

এই সমস্ত চিন্তা এ্যালবার্টকে আরও শান্ত এবং আরও সমাহিত করে তুললো। এ'ছাড়া আর কি স্মৃতি তার আছে? অন্য কিছু সে ভাবতে চায় না—ভাবতে পারবেও না। তার কাছে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, নিজের বিবেকের কাছে সে আর অপরাধী নয়। সে তার কর্ত্তব্য করেছে। সমস্ত আত্মা দিয়ে সে একটা শান্তি অনুভব করেছে। যথাযথ কর্ত্তব্য সম্পাদনের সচেতনায় সে বিশ্রাম লাভ করেছে। তার মনে আর কোন সন্দেহ নেই, কোন দ্বিধা নেই—সে সান্ত্বনা লাভ করেছে, তার অন্তর এখন অত্যন্ত লঘু, অত্যন্ত পবিত্র, অত্যন্ত শান্ত।

এই আকাশ, এই বাগান, রাত্রি, প্রভাত, গ্রীষ্মের তপ্ত দিন, সন্ধ্যার শান্ত বিভাষ—এরাই ছিল তার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই অসীম, উদার, অচঞ্চল জীবন তাকে কল্পনা-বিলাসী করে তুলেছিল—অফুরন্ত কল্পনা তার মনে বাসা বেঁধেছিল। এই সৌন্দর্য্য, এই বিরাটত্ব ও স্থিতির প্রতি একটা গভীর সুখানুভূতি নিয়ে সে উৎকণ্ঠাহীন লঘু অন্তরে মৃত্যুকে বরণ করতে পারতো।...

তারা তাকে একটা আপেল গাছের কাছে নিয়ে গেল। আপেল গাছটি মধ্য-বয়স ছাড়িয়ে এসে জীর্ণ হতে চলেছে। সৈনিকদুটি এখানে দাঁড়িয়ে মেজরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

গাছের গায়ে একটি কাটা চিহ্নকে রজনের মত এক প্রকার পদার্থ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল; এ্যালবার্ট তাকিয়ে দেখল—সেই চিহ্নটি বেরিয়ে পড়েছে। সে সযত্নে স্থানচ্যুত রজন আবার ঠিক স্থানে লাগালো। চাঁদের আলোতে গাছের গোড়ায় কি একটা জিনিষ চক্ চক্ করে উঠলো। অভ্যাস বশে এ্যালবার্ট নীচু হয়ে সেটা পরীক্ষা করলো। জিনিষটা আর কিছু নয়—একটা ফেলে যাওয়া পেরেক। অভ্যাসবশতঃ এ্যালবার্ট সেটা কুড়িয়ে নিল এবং পকেটে রেখে দিল। সৈনিকদুটি তার চালচলন সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

এ্যালবার্টের বসবার ইচ্ছা হোলো। দাঁড়িয়ে থাকবার ফলে তার মনোযোগের ব্যাঘাত হচ্ছিল ও তার শান্ত নিশ্চিন্ত একাগ্রতা ভঙ্গ হচ্ছিল। সে বসবার অনুমতি চাইলো। সৈনিকদুটির কোন আপত্তি হোলো না। সে আপেল গাছের দু'তিন পা দূরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসলো। এবার সে অপেক্ষা করতে পারে।

যদি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়, তাতেও কিছু যায় আসে না। তার কাছে সব সমান। একটা শান্ত, নিরুৎসুক, নিঃসংশয় আত্ম-কেন্দ্রিকতার কাছে এ্যালবার্ট ধরা দিয়েছে। সে বন্ধনে এতটুকু ফাঁকি নেই ; এ্যালবার্ট একটা সময়াতীত কালে উপস্থিত হয়েছে। সময়ের অস্তিত্ব আর নেই। একটি মুহূর্ত্তকে অনন্তকাল মনে হচ্ছে, অনন্তকাল মুহূর্তে রূপান্তরিত হচ্ছে। এ্যালবার্ট ভাবলো—নবীন জীবন ও শক্তি নিয়ে এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা—এর ভিতর কি শান্ত, গভীর, গর্ব্বিত নম্রতা ! সমস্ত আত্মার ভিতর তার অনুভূতি। প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি কত তুচ্ছ ! অক্ষয় অনন্ত আনন্দ ! সময় অস্তিত্বহীন, জীবনের শেষক'টি মুহূর্ত্ত—তার স্থায়িত্ব যাই হোক—একটা গভীর অচঞ্চল সন্তোষে পরিপূর্ণ।

তারা ভরা স্থির আকাশে যে পবিত্র ভাব—তার আত্মার ভিতর সেই ভাব সে অনুভব করলো।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করলো। এ্যালবার্টের শীত করতে লাগল।

বার্ণার্ড বললো—মেজরের ধরণই এইরকম। এটা তার কাছে একটা মজার খেলা। মিথ্যে তার জন্য অপেক্ষা করে আমরা সময় নষ্ট করছি, আর আমরা—আমরা শীতে কাঁপছি।

ফিলিপ তার কথা সমর্থন করলো।

অবশেষে মেজর এলো। আপেল গাছের কাছে এ্যালবার্টকে দাঁড় করানো হোলো। এ্যালবার্ট মনে মনে ভাবলো—এবার ওরা আমাকে গুলি করবে।

এই দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাতে তার ইতিমধ্যেই বহুবার মৃত্যু হয়েছে।

তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রভাতের কোমল দীপ্তির মত তার বিবেক আজ মুক্ত।

এতদিনে সংগ্রামের দৃঢ় সঙ্কল্প সে অর্জ্জন করেছে। লক্ষ লক্ষ লোক যে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণপাত করছে—সেই একই উদ্দেশ্যে তার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত প্রেম উৎসর্গীকৃত। সে অনুভব করলো—আজ সে সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা জয় করেছে। তার মনে আর কোন ভয় নেই, সব দুঃখ দূর হয়েছে। নগরীর স্মৃতি-সম্পদ হারানোর

ভয় আর তার মনে আতঙ্ক উপস্থিত করে না। তার গর্ব্ব হোলো—পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরবময় অতীতের একটা ভগ্নাংশ তার ভিতরেও সঞ্চারিত হয়েছে।

অন্তরে সে সাহস অনুভব করলো। মৃত্যুর প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে সে একটা গভীর আনন্দ অনুভব করলো।

ঠিক সেই সময়ে কতগুলি বন্দুকের আওয়াজ হোলো ··কিন্তু অন্য কোথাও, অনেক দূরে—একবার, দু'বার, তিনবার! এ্যালবার্ট ভাবলো—বোধ হয় ম্যাথু ও তার সঙ্গীরা জার্ম্মানদের গুলি করছে। ওরা আমাকে হত্যা করবার পূর্ব্বেই ওদের উপর আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হোলো। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা আগুনের গোলা তার চোখের সামনে ঝল্‌সে উঠলো। এ্যালবার্ট মাটিতে পড়ে গেল। জ্ঞান হারাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয় জীবনের জয়গানে এ্যালবার্টের ঠোঁট নড়ে উঠলো।

*　　　　*　　　　*

—গুলির আওয়াজ এলো কোনদিক হতে?

ট্রেণ ছাড়বার সঙ্কেতের অপেক্ষায় ম্যাথু অপেক্ষা করছিল, সে এই প্রশ্ন করলো। আয়োচিম অনুমান করলো—বোধ হয় রেল-কারখানার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে।

কিন্তু ভ্যান দার স্মিসেন নির্ভুলভাবে শব্দের দিক-নির্ণয় করতে পারত। সে বললো—ভ্যান্ একেনদের বাড়ীর দিক থেকে শব্দ এসেছে।

গুলির আওয়াজ আর পাওয়া গেল না, কিন্তু কোন সঙ্কেতও পাওয়া গেল না।

ষ্টেশনের আশেপাশে কিছুটা খোঁজখবর করে লেসানফাঁ ফিরে এলো।

—আর অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ট্রেণ ছাড়বে না।

—কি? কি বলছো? ছাড়বে না!—বিস্ময়ের ভঙ্গিতে কথাগুলি উচ্চারণ করে ম্যাথু তার দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করলো—যেন সামনের অন্ধকারে কোন লোককে সে ভয় দেখাচ্ছে।

—ট্রেণ আজ ছাড়বে না, কালও ছাড়বে না।

লেসানফাঁ বললো যে, মস্কোর কাছে রুশ-বিজয়ের সংবাদ পাবার পর রেল-

শ্রমিকরা কোন পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত না করেই একযোগে আঘাত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য—জার্ম্মান সৈন্যের স্থানান্তর বিলম্বিত করা। এই সিদ্ধান্ত একজন একজন করে সকলের ভিতরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পাশের লোকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি, একটু মাথা নাড়া—এর ভিতর দিয়েই তারা পরস্পরকে বুঝে নিয়েছে।

লেসানফাঁ বলে চললো—একেবারে গোড়া থেকে কাজ সুরু হয়। না দেখলে কিছুতেই বুঝতে পারবে না—সব কিছু তারা কি ভাবে এলোমেলো করে দিয়েছিল। ক্রিস্‌মাসের সময় নরম্যাণ্ডিতেও তারা এভাবে জিনিষ ছড়ায় না। সবশুদ্ধ বত্রিশটা ইঞ্জিন—তার একটিকেও এক পা আগুপিছু নড়ানো গেল না। জার্ম্মানরা চীৎকার করলো, ছুটোছুটি করলো, গালাগালি দিল—তারপর কর্ণেলকে ডেকে আনলো। কর্ণেল চীৎকার করে "মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে" তার আদেশ জানালো। কিন্তু হায় কর্ণেল! আমরা আর তোমাকে ভয় করি না। ইঞ্জিন খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কর্ণেল ক্রুদ্ধ হয়ে সেইখানেই ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে গুলি করে মেরে ফেললো। লোকটিকে তোমরা চেন—বুয়েৎ, এমিল বুয়েৎ, খুব ভালো লোক ছিল। কিন্তু হায় কর্ণেল! তবুও কেউ ভয় পেল না। দ্বিতীয় ইঞ্জিনেরও ঠিক সেই অবস্থা হোলো। তারপর তৃতীয়টি। তখন সেই হিটলার ভক্ত গুণ্ডাটা দ্বিতীয় ইঞ্জিন-ড্রাইভারকেও গুলি করে মেরে ফেললো। এই লোকটির নাম পল্—শারলেয়র-এর অধিবাসী। ওর উপাধি আমি জানি না। তারপর সে তৃতীয় ইঞ্জিন-ড্রাইভারকেও গুলি করে।

এই তৃতীয়টির নাম কি?—ম্যাথু জিজ্ঞাসা করলো।

কিন্তু লেসানফাঁ যেন এই প্রশ্ন শুনতেই পেল না। সে বলে চললো—তারপরেই একটা গুঞ্জন ওঠে। সকলে কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারা ডিপোর দিকে গেছে। সেখানে যে কি ঘটবে, আমি কিছু জানতে পারিনি।

—এই সবের উদ্যোক্তা কে?

লেসানফাঁ আগেই বলেছে—কেউ নয়! আপনা হতেই এ'সব হয়েছে।

—আমি তা বলিনি। আমি জানি উদ্যোক্তা কে। রুশরা—তারাই হচ্ছে উদ্যোক্তা। মস্কোর কাছে তাদের বিজয়-বার্ত্তা প্রত্যেকের ভিতর নতুন প্রাণ দিয়েছে।

লেসনফাঁ গান গেয়ে উঠলো—:

ওদের কাজে ওদের গর্ব্ব—আমরা পাই প্রেরণা।
শত্রুর সাথে সংগ্রাম—ভুল কখনো করবো না।

—ওদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। নিঃশব্দে বীরের সম্মান করবো।···এখন আমরা প্রত্যেকে দলশুদ্ধ ছুটে যাব। রেল-শ্রমিকদের সাহায্য করতে হবে। কিন্তু লেসানফাঁ, তুমি তো বললে না, তৃতীয় লোকটি—যাকে কর্ণেল গুলি ক'রে মারলো—সে কে ?

—সে হচ্ছে·····

—আমার ছেলে ?—ভ্যান্ দার স্মিসেন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলো।

—স্মিংসেন, তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। ম্যারিককে জামিন হিসাবে তারই ইঞ্জিনে তোলা হয়েছিল। আমি শুনেছি—কর্ণেল যখন তোমার ছেলেকে গুলি করবার জন্য রিভলবার উদ্যত করলো, তখন ম্যারিক ছুটে এসে লেতুলেং-এর উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও সে গুলি করলো। এর পরেই শ্রমিকেরা কাজ ছেড়ে উঠে আসে।

—একথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন ?

—আমি বলতে পারলাম না······কিভাবে বলবো······কান্নায় আমার গলা বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

রেল-লাইনের কাছে ম্যাথু এবং তার দলবলের উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত। প্রহরীদের ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে অজস্র গুলি বর্ষিত হোলো। ইঞ্জিন-কারখানার কাছে উত্তেজনা ও গোলমাল আরও বেড়ে গেল। কর্ণেল লেতুলেং এবং মেজর তাড়াতাড়ি ভ্যান্ একেনদের বাড়ীতে সেনাপতি-শিবিরে ফিরে গেল।

বারো জন জামিন-বন্দীকে তারা মুক্ত করলো। ম্যারিক তাদের মধ্যে একজন।

ম্যারিককে দেখবার পর ম্যাথু বুঝতে পারলো—তার নিজের উপর কত বড় ঝড় বয়ে গেছে। আনন্দ করবার শক্তিটুকুও আর তার ভিতর অবশিষ্ট ছিল না। ম্যারিকও কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। নিজের ভিতর ম্যারিক একটা

নতুন ভাব অনুভব করলো—যাকে সে বুঝে উঠতে পারছিল না। শুধু ম্যাথু নয়, সকলের প্রতিই তার ব্যবহার সংযত ও রুক্ষ হয়ে উঠলো।

ম্যাথু তার দলবলকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছড়িয়ে পড়বার আদেশ জানালো। ভ্যান্ একেন বাড়ীর অনতিদূরে খালের ধারে একটা ছোট ঘরে সে, তার স্ত্রী ও আয়োচিম আশ্রয় নিল। পরামর্শটা অবশ্য আয়োচিমের। সে বলেছিল—তোমার বাড়ীর কাছে তোমাকে তারা খুঁজবে না নিশ্চয়ই।

এখানে এসে ম্যাথু ও ম্যারিক জানতে পারলো—এ্যালবার্ট ভ্যান্ একেন বাড়ী উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে ধরা পড়ে এবং বাগানের ভিতর আপেল গাছের তলায় তাকে গুলি করে মারা হয়।

ম্যারিক বুঝতে পারলো—তাকে শীঘ্রই এই সহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে কোন তাড়া অনুভব করলো না। ম্যাথুও তাড়া দিল না। একটা বিষয়ে সে মনস্থির করেছিল—সেজন্য সে যেতে পারছিল না। কিন্তু তার স্ত্রীর কাছে কোন কথা প্রকাশ করে বলবার ইচ্ছা তার ছিল না।

পালাবার সমস্ত বন্দোবস্ত যখন ঠিক, তখন ম্যারিক ম্যাথুকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললো ; সে একবার সমাধিস্থান ঘুরে আসতে চায়।

ম্যাথু জিজ্ঞাসা করলো—কেন তুমি ওখানে যেতে চাও ?

ম্যারিক ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিল—আমাকে বিরক্ত কোরো না, আর কোন প্রশ্ন কোরো না বা বাঁধা দিতে চেষ্টা কোরো না। দোহাই তোমার, বক্তৃতা দিও না। লোকে যাই বলুক—আমার কিছু আসে যায় না।

ম্যারিকের একটা কথা ম্যাথুর মনে পড়লো। এবার সে বুঝতে পারলো, ম্যারিক কি চায়। রেণীর স্মৃতি-মাখানো জিনিষগুলো ম্যারিক সমাধিস্থানে কবর দিতে চায়। যুদ্ধজয়ের পর স্বাভাবিক জীবন আবার যখন ফিরে আসবে, সে'সময়ের জন্য সে একটি স্থান গড়ে নিতে চায়—যেখানে সে রেণীর স্মৃতির ভিতর নিঃসঙ্গ আশ্রয় পাবে।

ম্যারিকের কথামতো জিনিষগুলো কবর দেওয়া হোলো এবং সমাধিস্থানের মত তার উপর আবরণ দেওয়া হোলো। তারপর ম্যারিক সেখানে একা বসে রইলো।

আশে পাশে অন্যান্য সমাধি-ফলকগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে এবং মাটির উপর নুয়ে পড়েছে। কিন্তু কাঁচের তলায় রক্ষিত ফুলগুলো রয়েছে তাজা। মনে হোলো ফুলগুলো হাসছে। দিনের সূচনা হচ্ছে। সমুদ্রাগত ভিজে বাতাসে স্নাত হয়ে ডিসেম্বরের সূর্য্য উঠছে।

ম্যারিক নতজানু হয়ে বসলো। রেণীর কথা সে ভাবতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্যাপটেন্, মেজর ও কর্ণেল লেতুলেৎ-এর কথা বারবার তার মনে পড়লো। শুকিয়ে-যাওয়া লাল ফুলগুলোকে সূর্য্যের প্রথম কিরণ ছুঁয়ে গেল।

ম্যারিক ভাবলো—কেন এই সহর ছেড়ে যাব? আমরা চলে যাব, আর এই দস্যুগুলো এখানে থাকবে। যেসব ঘরে রেণী থাকতো, চলাফেরা করতো আর হাসতো—সেখানে দস্যুগুলোর পায়ের ছাপ পড়বে। এই কুৎসিত দস্যুগুলো আমাদের বাড়ীতে থাকবে, এখানে নিঃশ্বাস ফেলবে—আর আমি কিনা আমার শোক নিয়ে সরে যেতে চাইছি। তবে আমার শোকের মূল্য কি? কিসের জন্য আমার এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা? একদিন আমার যৌবনকে এরা হত্যা করেছিল—তার উত্তরে আমি শুধু শোক বহন করেছি। আমার পুত্রকে তারা হত্যা করেছে—তাও কি আমি নীরবে সহ্য করবো? কাল আমার স্বামীকে তারা হত্যা করবে···

ম্যারিকের মনে পড়লো—তার জীবনের চরম দুর্ভাগ্য কি ভাবে তাকে জীবন হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তার পুত্র-স্নেহ তার মনে ভবিষ্যতের প্রতি একটা আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। নিজের ভিতর এবার সে একটা শক্তির স্পন্দন অনুভব করলো। সেই গুপ্তশক্তি—তার ঘৃণা। পূর্ব্বে তার ঘৃণা লক্ষ্য-বস্তুকে চিনে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখন সে তার শত্রুকে চিনেছে! ভাগ্যকে সে আর ভয় করে না—কোন ভীতি আর তাকে আতঙ্কিত করতে পারবে না।

ম্যাথুর কাছে না গিয়ে ম্যারিক বিপরীত দিকে এগিয়ে চললো।

গুপ্ত-পথের মুখে ঝোপটার কাছে সে গেল। সে জানতো—বিস্ফোরণের সমস্ত বন্দোবস্ত তৈরী, শুধু আগুন ধরালেই হয়।

ম্যারিক ঝোপটার কাছে আরও এগিয়ে গেল। সে গাছের ডাল-ভাঙ্গার শব্দ

শুনতে পেল। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আবার সেই শব্দ হলো। ম্যারিক ভাবলো—জার্মানরা কি এদিকে আসছে ?

কিন্তু জার্মান নয়—ম্যাথু। সেও এসেছে একই উদ্দেশ্যে। একটি কথা না বলেও তারা পরস্পরকে বুঝতে পারলো। ম্যারিক ম্যাথুর পাশে এসে দাঁড়ালো।

আগুন ধরাবার আগে ম্যাথু ও ম্যারিক উপরের মিউজিয়াম-ঘরে গলার স্বর শুনতে পেল।

—ম্যারিক, এক মিনিট অপেক্ষা করো। ওরা কি বলছে, শোনা যাক…

কিন্তু কোন কথা তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলো না। কিন্তু কর্ণেল সেতুলেৎ ও মেজরের গলা ম্যারিক চিনতে পারলো।

ম্যারিক বললো—ম্যাথু, আর দেরী কোরো না।

রাত্রিশেষে সদ্য-জাগ্রত সহরবাসী যখন মস্কোর কাছে যুদ্ধ-জয়ের সংবাদে আনন্দ-চঞ্চল, সেই সময় ভ্যান্ একেনদের বাড়ীতে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ তাদের মনে নিশ্চিত ধারণার সৃষ্টি করলো—নতুন দিন আগত।